POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ (آل عمران:150)

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা যদি ঐ সকল লোকের আনুগত্য কর যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহা হইলে তাহারা তোমাদিগকে তোমাদের গোড়ালির উপর (তৎক্ষণাৎ পশ্চাতে) ফিরাইয়া লইবে এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ফিরিবে।

(আলে ইমরান:১৪৮)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 4

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 46

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 14 নভেম্বর, 2019 16 রবিউল আওয়াল 1441 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

সর্বক্ষণ আমি এই চিন্তাতেই থাকি যে, আমার বন্ধুরা যেন সমস্ত দিক থেকে সুখে-আরামে থাকে। এই সহানুভুতি ও সহমর্মিতার মধ্যে কোনও প্রকারের কৃত্রিমতা নেই, বরং যেভাবে একজন মমতাময়ী মা নিজের প্রত্যেকটি সন্তানের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে সারাক্ষণ উদ্বিগ্ন থাকে, সন্তান যত বেশি সংখ্যকই হোক কেন। অনরূপভাবে আল্লাহ্‌র পথে আমার হৃদয়েও বন্ধুদের জন্য অপার আবেগ ও সহানুভুতি রয়েছে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

বন্ধুদের জন্য সহানুভুতি

বস্তত, বন্ধুদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ন্যায়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, দেহের সামান্য কোনও অংশে ব্যাথা থাকলে, যেমন আঙুলেই যদি ব্যাথা থাকে তবে সারা শরীর অস্থির হয়ে ওঠে। আল্লাহ্‌ তা'লা ভালভাবে জানেন যে, অনুরূপভাবে সর্বক্ষণ আমি এই চিন্তাতেই থাকি যে, আমার বন্ধুরা যেন সমস্ত দিক থেকে সুখে-আরামে থাকে। এই সহানুভুতি ও সহমর্মিতার মধ্যে কোনও প্রকারের কৃত্রিমতা নেই, বরং যেভাবে একজন মমতাময়ী মা নিজের প্রত্যেকটি সন্তানের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে সারাক্ষণ উদ্বিগ্ন থাকে, সন্তান যত বেশি সংখ্যকই হোক কেন। অনরূপভাবে আল্লাহ্‌র পথে আমার হৃদয়েও বন্ধুদের জন্য অপার আবেগ ও সহানুভুতি রয়েছে। এই সহানুভুতির মধ্যে এমন পর্যায়ের ব্যকুলতা রয়েছে যে, যখন আমি পত্র মারফত কোনও বন্ধু সম্পর্কে কোনও দুঃখ-কষ্ট বা অসুস্থতা সম্পর্কে অবগত হই, তখন আমার অস্থিরতা বেড়ে যায় আর দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে পড়ি। বন্ধুদের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পায়, আমার দুঃখও তত বৃদ্ধি পায়। এমন কোনও সময় নেই যা আমাকে বিচলিত ও দুঃখভারাক্রান্ত করে রাখে না। কেননা, এত বিপুল সংখ্যক বন্ধুদের মধ্যে কেউ না কেউ কোনও না কোনও কষ্টের মধ্যে অবশ্যই থাকে, যার সংবাদ পেয়ে হৃদয় অস্থির ও ব্যকুল হয়ে ওঠে। কতটা সময় আমার দুঃখভারাক্রান্ত অবস্থায় অতিবাহিত হয়, সেকথা আমি নিজেই জানি না। যেহেতু আল্লাহ্‌ তা'লা ব্যতিত কোনও সত্তা এমন নেই, যা আমাকে এই সব দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে পারে, তাই আমি অনবরত দোয়ায় রত থাকি। আর প্রধান দোয়া হল, আমরা বন্ধুদেরকে আল্লাহ্‌ তা'লা যেন দুঃখ-কষ্ট থেকে পরিত্রাণ করেন। কেননা, আমাকে তাদের চিন্তা দুঃখভারাক্রান্ত করে তোলে। তখন আমি সকলের জন্য এই বলে দোয়া করি যে, যদি কেউ দুঃখে কষ্টে থাকে, তবে আল্লাহ্‌ তা'লা তাকে পরিত্রাণ করুন। আমার যাবতীয় চেষ্টা ও আবেগ অনুভুতি আল্লাহ্‌র কাছে দোয়াকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। দোয়ার গ্রহণীয়তায় অনেক আশা লুকিয়ে আছে।

দোয়া গৃহীত হওয়ার নীতি

আমার সঙ্গে পরম দয়াবান আল্লাহ্‌র স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি আছে। 'উজুবি কুল্লা দুয়ায়েকা' । (আমি তোমার প্রত্যেকটি দোয়া গ্রহণ করব)। কিন্তু আমি ভালভাবে একথা জানি যে, 'কুল্লা' বলতে সেই সব দোয়াকে বোঝানো হয়েছে যেগুলি গৃহীত হলে কোনও ক্ষতি হয় না। অপরপক্ষে, যেখানে আল্লাহ্‌ তা'লা সংশোধন ও উন্নতি চান, সেক্ষেত্রে কোনও দোয়া প্রত্যাখ্যাত হওয়াও গৃহীত হওয়ার নামান্তর। অনেক সময় মানুষ কোনও দোয়ার বিষয়ে বিফল মনোরথ হয়ে মনে করে বসে যে, খোদা তা'লা তার দোয়া প্রত্যাখ্যান করেছেন। অথচ তিনি তার দোয়া শোনেন। এক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমেই দোয়া গৃহীত হয়ে থাকে। কেননা, এই প্রত্যাখ্যানের অন্তরালেই তার জন্য রয়েছে কল্যাণ। মানুষ যেহেতু অপরিণামদর্শী, অন্তর্দৃষ্টিহীন। তাই সে বাহ্যিক আভরণের প্রতিই আকৃষ্ট হয়। তাই আল্লাহ্‌ তা'লার কাছে দোয়া করার সময় যখন সে বাহ্যত কল্যাণকর কোনও পরিণাম প্রকাশ পেতে দেখে না, তখন আল্লাহ্‌ তা'লা দোয়া গ্রহণ করেন নি বলে মনে করে সে যেন তাঁর সম্পর্কে বিতশ্রদ্ধ না হয়ে পড়ে। তিনি তো সকলের দোয়া শোনেন। اُدْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ। (মোমিন, আয়াত: ৬১)। এর মধ্যে রহস্য এই যে, দোয়া প্রত্যাখ্যানের মধ্যেই প্রার্থনাকারীর জন্য কল্যাণ নিহিত থাকে।

এটিই দোয়ার নীতি। আল্লাহ্‌ তা'লা দোয়া কবুল হওয়ার বিষয়ে আমাদের আশা-আকাঙ্খা ও কামনা-বাসনার অধীন নন। দেখ! শিশুরা মায়েদের কত প্রিয় হয়ে থাকে। মা চায় শিশু যেন কোনও প্রকার কষ্ট না পায়। কিন্তু শিশু যদি ধারালো ছুরি বা জলন্ত অঙ্গার হাতে নেওয়ার অনর্থক জেদ ধরে, তবে কি মা কখনও চাইবে, যদিও শিশুর প্রতি তার ভালবাসা ও মমতা অকৃত্রিম, শিশু হাতে জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে হাত দগ্ধ করুক বা ধারালো ছুরি দিয়ে হাত কেটে বসুক? কখনই নয়। দোয়ার গ্রহণীয়ণতার বিষয়েও এই নীতিই প্রযোজ্য। এ বিষয়ে আমার নিজের একটি অভিজ্ঞতা রয়েছে যে, দোয়ার মধ্যে যখনই কোনও ক্ষতিকর দিক থাকে, তখন সেই দোয়াটি কোনওভাবেই গৃহীত হয় না। একথা ভালভাবে বোঝা সম্ভব যে, মানুষের জ্ঞান স্বয়ংসম্পূর্ণ ও ত্রুটিমুক্ত নয়। অনেক কাজ কল্যাণকর মনে করে আমরা সানন্দে করে থাকি, আর নিজেদের ধারণায় তার পরিণামও কল্যাণকর মনে করি। কিন্তু পরিশেষে তা দুঃখ ও বিপদ হয়ে আমাদের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। কাজেই, একথা বলা যায় না যে, মানুষের আশা পূর্ণ হলেই সেগুলি অনিষ্টমুক্ত। মানুষ ভুল-ত্রুটির সমন্বয়ে গড়া। তাই কিছু কামনা বাসনা ক্ষতিকর হওয়া উচিত, এবং এমনটিই হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌ তা'লা যদি এমন বাসনা পূর্ণ করতেন, তবে এটি ঐশী করুণার পরিপন্থী হত। একথা সম্পূর্ণরূপে সত্য ও নিশ্চিত যে, আল্লাহ্‌ তা'লা তাঁর বান্দাদের দোয়া শোনেন এবং তা গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি প্রত্যেক নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ দোয়া গ্রহণ করবেন-এমনটি মোটেই নয়। কেননা, মানুষ রিপুর আবেগের কারণে পরিণাম বিবেচনা না করেই দোয়া করে, কিন্তু আল্লাহ্‌ যিনি আমাদের পরম হিতৈষী এবং সমস্ত কিছুর চুড়ান্ত পরিণাম সম্পর্কে সম্যক অবগত, তিনি সেই সব দোয়া প্রত্যাখ্যান করে দেন যেগুলি গৃহীত হলে প্রার্থনাকারীর জন্য অশুভ পরিণাম বয়ে আনবে। বস্তত এই প্রত্যাখ্যানেই দোয়া গৃহীত হওয়া নিহিত আছে।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৮৯-৯১)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৮ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর যুক্তরাষ্ট্র সফর

ন্যাশনাল মজলিস আমেলা (যুক্তরাষ্ট্র)-এর সঙ্গে বৈঠক

দোয়ার মাধ্যমে হুযুর আনোয়ার (আই.) বৈঠক আরম্ভ করেন।

হুযুর আনোয়ারের জিজ্ঞাসার উত্তরে আমীর সাহেব বলেন, এই মূহুর্তে এখানে যে সকল নায়েব আমীর ও সেক্রেটারীগণ উপস্থিত আছেন, তারা মোট ৩২জন।

এরপর হুযুর আনোয়ার নায়েব আমীর ডক্টর হামীদুর রহমান সাহেবকে তাঁর উপর ন্যস্ত দায়িত্বাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। নায়েব আমীর সাহেব বলেন, আমার উপর উত্তর-পশ্চিমের প্রদেশগুলির জামাতগুলির দায়িত্ব রয়েছে। আমীর সাহেবের নির্দেশ অনুসারে যখনই প্রয়োজন হয়, আমি সেই সব জামাতগুলি পরিদর্শনে যাই।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনি নিজে থেকে সেই জামাতগুলিতে যাওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন না ? আপনার উচিত ঐ সব জামাতগুলিতে নিজে থেকে পরিদর্শনে যাওয়া। সেই সব জামাতগুলির তাজনীদ কত, তাদের মধ্যে কতজন চাঁদা দেন, আর কতজন উপার্জনশীল ব্যক্তি রয়েছেন? সব থেকে বড় জামাত কোনটি, তার তাজনীদ কত? ডক্টর সাহেব বলেন, সব থেকে বড় জামাত হল LA East চাঁদাদাতাদের সংখ্যার বিষয়ে আমাকে এখনও পর্যন্ত আমীর সাহেবের পক্ষ থেকে সাম্প্রতিকতম তথ্য দেওয়া হয় নি।

হুযুর বলেন, তবে আমীর সাহেবের পক্ষ থেকে তথ্য পাওয়ার অপেক্ষায় বসে না থেকে আপনি নিজেই তাঁকে আপনার জামাতগুলির তথ্য দিতে পারতেন। আপনি নিজের জামাতের প্রতিনিধি। তাই এই পরিসংখ্যন আপনারই দেওয়া উচিত।

উপার্জনশীল আহমদীদের সংখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে ন্যাশনাল সেক্রেটারী মাল বলেন, সেখানে উপার্জনশীল চাঁদাদাতাদের সংখ্যা ১৫৫জন। চাঁদার আদায়ের দিকটি লক্ষ্য রেখে মানুষের আয় বিশ্লেষণ করে বোঝা গেছে এই আয় দারিদ্র সীমার নীচে।

একথা শুনে হুযুর আনোয়ার বলেন, তবে তো এমন ব্যক্তিদের জন্য নিশ্চয় আপনাদের চ্যারিটির প্রয়োজন হয়। আপনাদের যদি কেন্দ্র থেকে কোনও সাহায্যের প্রয়োজন থাকে, তবে আমাকে বলুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, মানুষকে তাদের প্রকৃত আয়া অনুসারে চাঁদা দিতে বলার জন্য কি কি পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে?

সেক্রেটারী মাল বলেন, আবশ্যিক চাঁদার পরিস্থিতি দেখার জন্য আমরা প্রতিটি জামাতের পরিসংখ্যন সংগ্রহ করেছি। এই জামাতগুলিতে সচেতনতা গড়ে তোলাই প্রথম পদক্ষেপ হবে।

এরপর হুযুর আনোয়ার সেক্রেটারী তবরীবয়তকে জিজ্ঞাসা করেন যে 'লা-ইস্ট'-এ যেখানে আপনাদের মসজিদ রয়েছে, সেখানে মগরিব ও এশার নামাযে কতজন উপস্থিত থাকেন? সেক্রেটারী সাহেব বলেন, এই মূহুর্তে আমার কাছে পরিসংখ্যন নেই। হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনি তরবারি ছাড়াই যুদ্ধ ক্ষেত্রে নেমে পড়েছেন।

এরপর নায়েব আমীর ডক্টর নাসীম রহমতুল্লাহ্ সাহেব বলেন, আমি নায়েব আমীর ছাড়াও, অডিও-ভিডিও বিভাগের ন্যাশনাল সেক্রেটারী এবং মিডিয়া টিমের দায়িত্বও সামাল দিই।

নায়েব আমীর ওয়াসীম মালিক সাহেব বলেন, তার দায়িত্ব হল সমস্ত জামাত পরিদর্শন করে মসজিদ ফান্ড সংগ্রহ করা। অনুরূপভাবে যুক্তরাষ্ট্র জামাতের আইটি বিভাগও তার দায়িত্বে রয়েছে।

হুযুর বলেন, মসজিদ ফান্ডের জন্য কত টাকা একত্রিত করেন? চলতি বছরে কি পরিমাণ অর্থ একত্রিত হয়েছে?

নায়েব আমীর বলেন, এ বছর ২০১৮-১৯ -এর প্রথম ত্রৈমাসিকে আমরা ২ লক্ষ ১৮ হাজার ডলার সংগ্রহ করেছি। গত আর্থিক বছরে ৩৯ লক্ষ মার্কিন ডলার একত্রিত করেছিলাম।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এর মধ্যে কতটুকু খরচ করা হয়েছে? আমীর সাহেব বলেন, সমস্ত টাকা খরচ হয়ে গেছে, এমনকি মসজিদ ফান্ড এই মূহুর্তে ঘাটতি রয়েছে।

এরপর হুযুর আনোয়ার নায়েব সদর এবং সহায়ক সদর সাহেবের পরিচয় জানতে চান। হুযুর এ বিষয়ে নির্দেশনা দান করেন যে, আসন বিন্যাস এমন হওয়া উচিত যেখানে সদর সাহেব এবং মুতামিদ পাশাপাশি আসনে বসবেন, এরপর সমস্ত মুহতামিম এবং সহায়ক সদর,আর অপর পাশে বসবেন নায়েব সদর।

এরপর হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে মুহতামিম আতফাল বলেন, আতফালদের মোট তাজনীদ ১২৪০জন। আতফালদের তরবীত প্রসঙ্গে আমাদের লক্ষ্য হল ন্যাশনাল ইজতেমা, আঞ্চলিক ইজতেমা ও আতফাল র‍্যালির আয়োজন।

হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন, স্থানীয় স্তরে তরবীয়তী ক্লাসের আয়োজন করেন? সেই ক্লাসগুলিতে কতজন করে আতফাল অংশগ্রহণ করে? উত্তরে মুহতামিম সাহেব বলেন, প্রায় ৬০০ আতফাল এই ক্লাসে অংশ গ্রহণ করে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আতফালরা খুদ্দামে উপনীত হওয়ার পর ততটা সক্রিয় থাকে না। আতফালদের সঠিক অর্থে তরবীয়ত বা প্রশিক্ষন হলে খুদ্দামে উপনীত হওয়ার পর তাদের সক্রিয়তা স্তিমিত হয় না।

এরপর মুতামিদ সাহেব বলেন, গত বছর এডিশিনাল মুতামিদ হিসেবে কাজ করছিলাম আর এবছর মুতামিদ হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছি। আমাদের মোট মজলিস ৭২ টি, গত বছর ৭৪ টি ছিল।

হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন,আপনাদের মজলিস সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার পরিবর্তে হ্রাস পাচ্ছে কেন? কিছু মজলিসকে কি মিলিয়ে দিয়েছেন? মুতামিদ সাহেব বলেন, কিছু মজলিসকে পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন, প্রত্যেকটি মজলিস রিপোর্ট পাঠায়? মজলিসগুলি সক্রিয়? এর উত্তরে মুতামিদ সাহেব বলেন, আলহামদোলিল্লাহ। সমস্ত মজলিসের পক্ষ থেকে ১০০ শতাংশ রিপোর্ট আসে।

হুযুর আনোয়ার মুহতামিমদের কে সামনে এসে বসার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, খুদ্দামুল আহমদীয়ায় কাজ আপনারা অনেক দিন থেকে করছেন, কিভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে হয় সেকথা আপনাদের ভালভাবে জানা আছে। সর্বপ্রথম বিষয়টি হল নিজেদের বাৎসরিক অনুষ্ঠানসূচি তৈরী করুন। যদি প্রাক্তন মুহতামিমদের কোনও প্রকল্প থেকে থাকে তাদের উচিত সেগুলি বর্তমান মুহতামিমদের হাতে দেওয়া। প্রাক্তন মুহতামিমের পক্ষ থেকে যদি কোনও প্রকল্প আছে, তবে ভাল কথা। অন্যথায় আপনারা সারা বছরের জন্য কাজের রূপরেখা নির্ধারণ করুন। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিষয়ে বদ্ধপরিকর হতে হবে। আমি লক্ষ্য করেছি, খুদ্দামদের ন্যাশনাল ইজতেমায় এক হাজারে বেশি খুদ্দাম অংশগ্রহণ করেনি। স্থানীয় স্তরের ইজতেমার বিষয়ে আমার জানা নেই।

হুযুর জানতে চান যে, ইস্টকোস্ট ও ওয়েস্ট কোস্ট অঞ্চলে আপনাদের ইজতেমা হয়? সদর সাহেব বলেন, পূর্বে ইজতেমা হত, এখন হয় না। বর্তমানে মজলিসগুলিকে ১২টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেক অঞ্চল নিজেদের ইজতেমার আয়োজন করে।

হুযুর জানতে চাইলে আঞ্চলিক সদর বলেন, তাঁর অঞ্চলে খুদ্দামদের তাজনীদ ৩৭০, যাদের মধ্যে ৯০ জন খুদ্দাম স্থানীয় ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। আরও একজন খাদেম বলেন, তাঁর অঞ্চলে খুদ্দাম ও আতফালের মোট তাজনীদ ৪৫৪জন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: খুদ্দাম ও আতফালদের তাজনীদ একত্রে বললে বিষয়টি অস্পষ্ট থেকে যায়। আপনাদের নাযিম আতফাল তাদের তাজনীদ বলতে পারেন। আপনি হলেন খুদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ। তাই, পৃথক পৃথক এবং স্পষ্ট তথ্য দিবেন।

যা শুনে কায়েদ সাহেব বলেন, আমাদের অঞ্চলে মোট খুদ্দাম ৩৪০ জন এবং আতফাল ১১৪জন। ৩৪০জন খুদ্দামদের মধ্য থেকে ৮০জন ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেছিলেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এটা তো খুব বেশি হলে এক-চতুর্থাংশ। আঞ্চলিক স্তরেও জাতীয় স্তরের মত দশা।

হুযুর বলেন: আমি এও দেখেছি যে, আপনাদের অনুষ্ঠানসমূহে আউট ডোর এক্টিভিটি এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। ইজতেমার সময় সত্তর থেকে আশি শতাংশ অনুষ্ঠান তালিম-তরবীয়ত ভিত্তিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর মধ্যে সাধারণ জ্ঞান, ধর্মীয় শিক্ষাবলী, তিলাওয়াত, আযান প্রভৃতি বিষয়ের উপর প্রতিযোগিতা করা যেতে পারে। এছাড়াও অন্যান্য প্রশ্নোত্তরের অনুষ্ঠানও করা যায়। আগামী বছরগুলিতে এভাবেই অনুষ্ঠানমালা প্রস্তুত করবেন। আমি সদর সাহেবকে বলেছিলাম যে সারা বছরের জন্য কোনও একটি থীম চিন্তা করে আমাকে বলুন। আমি বলেছিলাম, তিনটি বিষয়ের মধ্যে যেটির উপর থীম চূড়ান্ত হবে, সেটিকে নিয়েই আপনারা কাজ করবেন। আপনাদের সারা বছরের কর্মসূচি সেই থীমকে ঘিরেই আবর্তিত হবে। আপনাদের ন্যাশনাল এবং লোকাল ইজতেমার অনুষ্ঠানও সেই থীমকে ঘিরেই হবে। যাতে কি কি অর্জন করতে পেরেছেন, বছর শেষে আপনারা জানতে পারেন।

জুমআর খুতবা

যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার জন্য মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ ঘর নির্মাণ করেন। (আল হাদীস)

যারা আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নতজানু হয়, আল্লাহ্ তাদের ঈমান ও বিশ্বাস বৃদ্ধি করেন।

পরকালের প্রতি বিশ্বাসই আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের প্রতি মনোযোগী করে , সেই ইবাদত কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হয়ে থাকে।

নির্ধারিত সময়ে নামায পড়া আবশ্যক।

আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, সেই মসজিদে নামাযের জন্য দন্ডায়মাণ হও, যার ভিত্তি তাকওয়ার উপর রয়েছে।

মসজিদ আবাদ করার জন্য বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন।

মসজিদ নির্মাণকে স্বার্থক করে তোলা, তাকে জান্নাত নিয়ে যাওয়ার মাধ্যম করে তোলা এবং এর নির্মাণ জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করা- এ বিষয়গুলি আমাদের উপর অনেক বড় দায়িত্ব ন্যস্ত করে।

যদি কারো ভয় আমাদের হৃদয়ে থাকে, তবে সেটি হল খোদার ভয়।

নামায শত-সহস্র ভুল-ত্রুটি দূর করে আল্লাহ্‌র নৈকট্যভাজন করে।

আহাদীস নববী এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণীর আলোকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া এবং দোয়ার সূক্ষ্ম প্রজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা, আহমদীদেরকে প্রকৃত তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে মসজিদ আবাদ করার উপদেশ।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বায়তুল ফুতুহ, মডার্ন থেকে প্রদত্ত ৪ অক্টোবর , ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা (৪ ইখা, ১৩৯৮ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন।

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰٓى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ (التوبۃ:18)

(সূরা আত্ তাওবা: ১৮)

দীর্ঘদিন পর আল্লাহ্ তা'লা আহমদীয়া জামা'ত ফ্রান্সকে এখানে আরো একটি মসজিদ নির্মাণের সৌভাগ্য দান করেছেন। এখানে এই স্ট্রাসবুর্গ শহরে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় নবাগত আহমদী এবং অ-পাকিস্তানী আহমদীদেরও বিপুল জনগোষ্ঠী রয়েছে, প্রায় ৭৫ ভাগই অ-পাকিস্তানী আহমদী। আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তারা নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় সমৃদ্ধ। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এখানে একটি মসজিদ দান করেছেন। এখন এখানে বসবাসকারী আহমদীরা পূর্বের তুলনায় অধিকহারে জামা'তের ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত হতে পারবে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এর সৌভাগ্যও দান করুন। আমি যে আয়াতটি পাঠ করেছি, যা আপনারাএইমাত্র শুনেছেন, উক্ত আয়াতের অনুবাদ পড়ছি,

"আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহ সে-ই আবাদ করে, যে আল্লাহ্ তা'লা ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে এবং নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় আর আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। অতএব অচিরেই এমন লোকদেরকে সফলতার দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।"

আল্লাহ্ তা'লা মসজিদ নির্মাণকারী এবং তা আবাদ বা রক্ষণাবেক্ষণকারীদের এই বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন যে, তারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনয়নকারী। অর্থাৎ এই কথার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখা যে, সকল শক্তির উৎস একমাত্র খোদা তা'লার সত্তা। অন্য সব কিছু তুচ্ছ। অতএব এই ঈমান লাভের জন্য আল্লাহ্ তা'লার সমীপে বিনত হওয়া এবং তাঁর ইবাদত করা একান্ত আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সমীপে বিনয়ীদেরও ঈমান ও বিশ্বাসে সমৃদ্ধ করেন। এরপর পরকালের প্রতি বিশ্বাসকেও আল্লাহ্ তা'লা মসজিদে আগমনকারীদের একটি বৈশিষ্ট্য বা শর্ত আখ্যা দিয়েছেন। কেননা পরকালের প্রতি বিশ্বাসই মানুষকে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের প্রতি আকৃষ্ট করে, অর্থাৎ এমন ইবাদত যা শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করা হয়। একথা বর্ণনা করতে গিয়ে একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

পরকালে বিশ্বাসের নগদ-প্রাপ্তি হলো- এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। আর প্রকৃত ভয় এবং খোদাভীতি ছাড়া সত্যিকার তত্ত্বজ্ঞান লাভ হতে পারে না। তিনি বলেন, অতএব স্মরণ রাখ, পরকাল সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি হওয়া ঈমানকে বিপদে নিক্ষেপ করে আর শুভ পরিণতি লাভের ক্ষেত্রে ত্রুটি দেখা দেয়।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৩-৫৪)

অর্থাৎ শুভ পরিণতি লাভ করা তখন আর নিশ্চিত থাকে না। এরপর এর নিশ্চয়তা নেই যে, মানুষ ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। অতএব প্রকৃত ইবাদতকারী এবং মসজিদ আবাদকারী হলো সেই ব্যক্তি, যার হৃদয়ে পরকাল সম্পর্কে কখনো সংশয় সৃষ্টি হয় না আর শুভ পরিণতির জন্য যে আল্লাহ্‌র সমীপে বিনত থাকে। অতঃপর বলেন, মসজিদ তারাই আবাদ করতে পারে অথবা মসজিদ নির্মাণের লাভ তাদেরই হয় যারা নামায

প্রতিষ্ঠাকারী। যারা এই অঙ্গীকার করে যে, আমরা এই মসজিদ জগদ্বাসীকে কেবল এটি দেখানোর জন্য নির্মাণ করি নি যে, আমাদেরও একটি মসজিদ রয়েছে, বরং এটিকে পাঁচ বেলা আবাদ করা এখন আমাদের কাজ। আল্লাহ্ তা'লা এখানে নামায কায়েমকারী বা প্রতিষ্ঠাকারী বলেছেন। কায়েম বা প্রতিষ্ঠা করার অর্থই হলো বাজামা'ত নামায আদায় করা। আল্লাহ তা'লা এখানে নামায কায়েমকারী বলেছেন আর এর অর্থ হলো বাজামাত নামায আদায় করা। অতঃপর যাকাত ও আর্থিক কুরবানীর প্রতি মনোযোগের বিষয়টি রয়েছে। মসজিদ আবাদকারীদের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত যে তারা আল্লাহ তা'লার ধর্ম প্রচারের জন্য ত্যাগ-তিতিক্ষা করবেন এবং আল্লাহ তা'লার বান্দার অধিকারও আদায় করবেন। এসব করা উচিত, যাতে আমাদের হৃদয়ে খোদা-ভীতি বৃদ্ধি পায় আর আমরা যেন তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনে পূর্ণ সচেষ্ট হই। আল্লাহ তা'লা বলেন, এসব কর্ম সম্পাদনকারীরাই আল্লাহর দৃষ্টিতে হেদায়াতপ্রাপ্ত বা হেদায়েতপ্রাপ্ত লোক হিসাবে পরিগণিত হবেন।

তাই আমাদের উচিত সর্বদা এই দোয়া করা আর তদানুসারে চেষ্টা-সাধনা করা এবং নবাগত ও পুরনো সকল আহমদীর আল্লাহ তা'লার সমীপে অবনত হয়ে এই নিবেদন করা, বিশেষত পাকিস্তান থেকে আগত পুরনো আহমদীর এই দোয়া করার ক্ষেত্রে অধিক দায়িত্ব বর্তায়, তারা যেন নবাগতদের সামনে নিজেদের উন্নত দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন। সবার এই দোয়া করা উচিত, হে আল্লাহ! মসজিদ নির্মাণের পর আমাদেরকে এই চেতনার সাথে এবং নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থাকে এই শিক্ষাসম্মত করে মসজিদ আবাদ করার তৌফিক দাও এবং আমাদেরকে হেদায়েতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত কর। আমাদের দুর্বলতা ও উদাসীনতার কারণে, মসজিদ আবাদ করা সম্পর্কে আল্লাহ তা'লার নির্দেশে না মানার কারনে পাছে আমরা আমাদের ইহ ও পরকাল ধ্বংস না করে ফেলি; হে আল্লাহ! তুমি নিজ কৃপাগুণে আমাদেরকে বিভ্রান্ত হওয়া থেকে রক্ষা করো এবং আমাদেরকে সহজ-সরল পথে পরিচালিত রেখো, আমাদের নিয়্যতকে স্বচ্ছ ও পবিত্র রেখো; আমরা যেন তোমার অধিকারও আদায় করতে পারি এবং অত্রাঞ্চলে তোমার ধর্মের বাণীও যেন মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারি। আমরা যেন এই মসজিদ নির্মাণ করার পাশাপাশি তোমার প্রেরিত প্রতিশ্রুত মসীহর নির্দেশনা অনুযায়ী এই মসজিদকে ইসলাম প্রচারের মাধ্যমে পরিণত করতে পারি। স্বীয় কৃপাবলে তুমি আমাদেরকে তোমার প্রিয় নবীর (সা.) সেই উক্তির পরিপূরণস্থল বানিয়ে দাও তথা, ''যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'লার খাতিরে মসজিদ নির্মাণ করে আল্লাহ তা'লাও তার জন্য জান্নাতে ঠিক তেমনই ঘর নির্মাণ করে দেন''।

(সহী বুখারী, কিতাবুস সালাত, হাদীস-৪৫০)

অতএব, তুমি আমাদেরকে তোমার প্রকৃত মোমেন বান্দা বানিয়ে স্বীয় কল্যাণরাজীতে ভূষিত করতে থাক।

অতএব এসব কল্যাণ লাভের জন্য প্রত্যেক আহমদীর উচিত প্রথমে নিজেদের নামাযের খোঁজ নেওয়া যে, নিয়মিত পাঁচ বেলার নামায পড়ার প্রতি তার মনোযোগ আছে কিনা; এরপর বাজামাত নামায পড়ার প্রতি মনোযোগ আছে কি না। আমাদের মসজিদ হয়ে গেছে– এটাই তো যথেষ্ট নয়। জান্নাতে ঘর বানানোর জন্য কেবল মসজিদ বানিয়ে ফেলাই যথেষ্ট নয় বরং ঈমানের সাথে সৎকর্মেরও প্রয়োজন রয়েছে। খোদার নির্দেশ মেনে চলার আবশ্যকতা রয়েছে এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জামাতভুক্ত হওয়ার দাবি পুরণের প্রয়োজন রয়েছে। প্রতি বছর সাধারণ মুসলমানরা হাজার হাজার মসজিদ নির্মাণ করে থাকে কিন্তু যদি এসবে বিভেদ ও বিভাজনের শিক্ষা দেওয়া হয় এবং এগুলোতে যদি আল্লাহ তা'লার ভয়-ভীতি এবং আল্লাহ তা'লার বান্দার অধিকার প্রদানের পরিবর্তে ব্যক্তিস্বার্থ বা কেবল নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের স্বার্থের কথা বলা হয় বা তথাকথিত আলেম-উলামা যেসব নতুন নতুন বিদাতের সূচনা করছে তার চর্চা হয় যার সাথে মহানবী (সা.)-এর সুন্নতের দূরতম সম্পর্ক নেই তাহলে সে সব মসজিদ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দৃষ্টিতে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার মত মসজিদ নয়। তাই মসজিদের অধিকার প্রদান করা এবং এটিকে জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যমে পরিণত করা এবং মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে জান্নাতে ঘর তৈরি করা– এক অনেক বড় দায়িত্ব। আর এই গুরুদায়িত্বকে উপলব্ধি করে প্রত্যেক আহমদীর এতে আমল করা উচিত এবং মসজিদের অধিকার আদায়ে চেষ্টা করা উচিত। এই যুগে আমাদেরকে মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার সেবক একজন প্রকৃত মুসলমান হওয়ার, ইবাদতসমূহ ও মসজিদের অধিকার আদায় করার এবং আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্ট জীবের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করার জন্য যেভাবে নির্দেশনা দিয়েছেন তা উপলব্ধি করা এবং সে অনুসারে কাজ করা আবশ্যক। তখনই আমরা বলতে পারব যে, আমরা আল্লাহ্ তা'লা ও পরকালের প্রতি দৃঢ় ও পরিপূর্ণ ঈমান বা বিশ্বাস রাখি; আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজেদের নামায প্রতিষ্ঠাকারী, এছাড়া নিজেদের ধনসম্পদ উৎসর্গ করে আল্লাহ্ তা'লার বান্দার প্রাপ্য অধিকারও প্রতিষ্ঠাকারী । যদি অন্তরে কোন সত্তার ভয় থেকে থাকে তা হলো কেবল আল্লাহ্র ভয়। আমাদের হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লারই ভয়-ভীতি বিরাজমান কেননা আমরা তাঁকে ভালোবাসি। জাগতিক কোন কিছুকে আমরা ভয় পাই না আর পার্থিব কোন জিনিসের প্রতি আমাদের সেই ভালোবাসা নেই যা আল্লাহ্ তা'লার প্রতি রয়েছে। আমরা আমাদের ঈমান ও ধর্মের খাতিরে আমাদের জাগতিক বা পার্থিব স্বার্থ বিসর্জন দিই। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) একজন প্রকৃত আহমদী তথা খোদা তা'লার সত্যিকার বান্দা হওয়ার জন্য যে সকল উপদেশ আমাদের দিয়েছেন সেগুলো হতে কয়েকটি এখন আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে যেসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দান করেছেন– হাত, পা এবং অন্যান্য অঙ্গপতঙ্গ যেমন চোখ, জিহ্বা প্রভৃতি যে অঙ্গই আমাদেরকে দান করেছেন তা নষ্ট করার জন্য দান করেন নি, বরং ভারসাম্য বজায় রেখে সেগুলোর বৈধ ব্যবহারই সেগুলোর প্রকৃত বিকাশ। এগুলোর যেন প্রকৃত বিকাশ সাধিত হয়। কিন্তু এর বিকাশ কীভাবে সাধিত হবে! সেগুলোর বৈধ ব্যবহার করতে হবে আর অবৈধ ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে। এজন্যই ইসলাম জননেন্দ্রিয় কে অকেজো করে দেওয়া বা চোখ উপড়ে ফেলার শিক্ষা দেন নি বরং এগুলোর বৈধ প্রয়োগ এবং আত্মশুদ্ধি করতে হবে। এমন শিক্ষা দেন নি যে, কুদৃষ্টির আশংকার কারণে চোখ উপড়ে ফেলে দাও। বরং এর বৈধ ব্যবহার করা প্রয়োজন। এছাড়া জননেন্দ্রিয়ের শক্তিবৃত্তিকেও অকেজো করে দিতে বলে নি বরং সেগুলোকে পবিত্র করা এবং সেগুলোর পবিত্র ব্যবহার সুনিশ্চিত করাই হলো আসল বিষয়। তিনি (আ.) বলেন, কাদ আফলাহাল মু'মিনুন এবং একইভাবে এখানেও বলেছেন অর্থাৎ একজন মুত্তাকী ব্যক্তির জীবনের চিত্র অঙ্কন করে পরিশেষে ফলাফলস্বরূপ বলেছেন **'ওয়া উলাইকা হুমুল মুফলেহুন।'** মুত্তাকীর জীবনচিত্র অঙ্কন করে প্রথমে বলেছেন,'কাদ আফলাহাল মুমিনুন' মুত্তাকীর চিত্র অঙ্কন করে বলেছেন 'ওয়া উলাইকা হুমুল মুফলেহুন'। অর্থাৎ সেসব লোক যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, অদৃশ্যের ওপর ঈমান রাখে, নামায দোদুল্যমান হলে তারা একে দাঁড় করায়। অর্থাৎ নামাযে বিভিন্ন ধরণের চিন্তা-ভাবনা আসে কিন্তু এরপর আল্লাহতা'লার প্রতি মনোযোগী হয়। আল্লাহতা'লা প্রদত্ত রিযিক হতে দান করে। অর্থাৎ আল্লাহতা'লা যে নেয়ামতসমূহ দিয়েছেন তা থেকে তাঁর পথে ব্যয় করে। কুপ্রবৃত্তির মাথাচাড়া দেওয়ার আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও কোন অত্যুক্তি না করেই অতীত এবং বর্তমানের ঐশী গ্রন্থাবলীর ওপর ঈমান আনে। আল্লাহ বলেছেন সকল গ্রন্থে ঈমান আন তাই তারা ঈমান আনে এবং পরিশেষে তারা এই দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন করে। এরাই সেসব লোক যারা হেদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তারা এমন একটি পথে রয়েছেন যা সোজা এগিয়ে যাচ্ছে, যার মাধ্যমে মানুষ সফলতা পর্যন্ত লাভ করে। এরাই সফল মানুষ যারা উদ্দিষ্ট লক্ষ্য-স্থলে পৌঁছে গেছে এবং পথের সমূহ-বিপদাবলী থেকে মুক্তিলাভ করেছে। পুনরায় বলেন, এজন্য শুরুতেই আল্লাহতা'লা আমাদেরকে তাকওয়ার শিক্ষা দিয়ে এমন একটি পুস্তক দিয়েছেন যাতে তাকওয়ার নসীহত বিদ্যমান। সুতরাং আমার জামাতের সদস্যদের উচিত, পার্থিব সকল উদ্বেগের চেয়ে অধিকতর এ উদ্বেগকে নিজের অন্তরে সৃষ্টি করা যে, তাদের মাঝে তাকওয়া রয়েছে কিনা।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৫)

মানুষ কীভাবে বুঝবে যে, তার মাঝে তাকওয়া রয়েছে কিনা আর মুত্তাকী কারা? এটা স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি বলেন, খোদার বাণী থেকে জানা যায় মুত্তাকী তারা –যারা নম্রতা এবং বিনয়ের সাথে চলে। অত্যন্ত নম্রতা, বিনয় তাদের মাঝে থাকে। তারা দাম্ভিকতাপূর্ণ কথা বলেন না, অহংকার তাদের মাঝে একেবারেই থাকে না। তাদের কথাবার্তা এমন হয় যেভাবে ছোটরা বড়দের সাথে কথা বলে। তিনি বলেন, আমাদের সর্বাবস্থায় সেই

যুগ ইমাম-এর বাণী

কোনও ধর্ম, জাতি বা সম্প্রদায় আধ্যাত্মিকতা ব্যাতিরেকে টিকে থাকতে পারে না। **(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৬১)**

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

কাজই করা উচিত যাতে আমাদের সফলতা নিহিত থাকে। আল্লাহতা'লা কারো দায়িত্ব নেন নি, তিনি খাঁটি তাকওয়ার আকাঙ্খা করেন; যে-ই তাকওয়া অবলম্বন করবে, সে-ই উচ্চ মর্যাদা অর্জন করবে।" তিনি বলেন, "মহানবী (সা.) বা হযরত ইব্রাহীম (আ.), তাদের কেউ উত্তরাধিকার সূত্রে সম্মান পান নি। যদিও আমরা বিশ্বাস করি যে মহানবী (সা.)-এর সম্মানিত পিতা আব্দুল্লাহ্ মুশরিক ছিলেন না, কিন্তু তিনি নবুওয়ত তো দান করেন নি; এটি তাঁর প্রকৃতিগত নিষ্ঠার কারণে ঐশী কৃপা ছিল; এটিই ঐশী কৃপাকে আকৃষ্ট করেছিল। হযরত ইব্রাহীম (আ.), যিনি আবুল আম্বিয়া (অর্থাৎ নবীদের পিতা) ছিলেন, তিনি তাঁর সত্যপরায়ণতা ও তাকওয়ার কারণেই পুত্রকে উৎসর্গ করতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নি; নিজেও আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। আমাদের নেতা ও মনীব হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা-ই দেখুন! তিনি সর্বপ্রকার অশুভ আন্দোলনের মোকাবিলা করেছেন, বিভিন্ন ধরনের বিপদের সম্মুখিন হয়েছেন এবং কষ্ট সহ্য করেছেন কিন্তু এসবের কোন পরোয়া করেন নি। এই নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার কারণেই আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেছেন; এজন্যই তো আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, **'ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইয়ুসাল্লুনা 'আলান্নাবিয়্যে- ইয়া আইয়্যুহাল্লাযীনা আমানূ সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমূ তাসলীমা'** (সূরা আহযাব: ৫৭)

অর্থাৎ 'আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর সকল ফেরেশতা রসূলের উপর দরূদ প্রেরণ করেন। হে ঈমানদারগণ, তোমরাও এই নবীর উপর দরূদ প্রেরণ কর ও তার প্রতি সালাম প্রেরণ কর।'

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৭)

সুতরাং আমাদেরকে এই নির্দেশই দেওয়া হয়েছে, যদি দোয়া কবুল করাতে চাও তবে মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ কর। আর দরূদশূন্য দোয়া আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে না, তাতে মানুষ সফলতা অর্জন করতে পারে না। অতএব ইবাদতের মানোন্নয়নের জন্য এবং আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের জন্য দরূদ আবশ্যক। আর দরূদ প্রেরণকারী অবশ্যই মহানবী (সা.)-এর আদর্শকে দৃষ্টিপটে রাখবে। তিনি (সা.) ইবাদতের কী মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন আর নিজ উম্মতকে কী জোরালো নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি (সা.) বলেছেন, 'আমার চোখের স্নিগ্ধতা নামাযের মাঝে রয়েছে।'
(সুনান নিসাঈ, কিতাবু আশারাতুন নিসা, বাব হুববুন নিসা, হাদীস-৩৩৯১)

আবার সৃষ্টজীবের অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রেও তিনি (সা.) এমন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন যার উপমা খুঁজে পাওয়া কঠিন; তিনি নিজের জন্য কখনো চিন্তাও করেন নি। যা কিছু ছিল, সমগ্র উপত্যকার সমান সম্পদ থাকলেও তিনি তা বিলিয়ে দিয়েছেন; কোন সাহায্যপ্রার্থী এলে তাকে রিক্ত হস্তে ফিরিয়ে দেন নি।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল, বাব ফি সাখাওয়াহ, হাদীস-২৩১২)

এর পাশাপাশি তাঁর হাত সব সময় সৃষ্টির সেবায় নিয়োজিত থাকত। অতএব দরুদ প্রেরণকারী রসুল করীম (সা.)-এর উত্তম আদর্শকে দৃষ্টিপটে রেখে যখন দরুদ প্রেরণ করে তখন তার দৃষ্টিও সেই আদর্শের উপর থাকে যা রসুল করীম (সা.) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অবস্থা এটি হলে তখন আল্লাহ তা'লা ও তাঁর প্রিয় নবী ও তার প্রিয় বান্দাদের প্রতি আমাদের ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ এবং তাদের প্রতি দরুদ প্রেরণ করার কারণে আমাদের দোয়াসমুহকে কবুলিয়্যাতের মর্যাদা দান করেন । আর কেবলমাত্র তখনই আমরা আল্লাহ তা'লার নৈকট্য লাভ করে সহিষ্ণুতা ও দীনতা প্রদর্শনকারী হয়ে সে সকল লোকদের অন্তর্ভূক্ত হতে পারি যারা তাকওয়ার পথে বিচরণকারী। এরাই সে সকল লোক যারা কৃতকার্য, এরাই সফলকাম। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেন, স্মরণ রেখো আমরা যদি বুলি-সর্বস্ব হই তাহলে কোন লাভ নেই। তিনি বলেন,বিজয়ের জন্য তাকওয়া আবশ্যকী। যদি বিজয় চাও তাহলে মুত্তাকী হয়ে যাও। আর এই প্রকৃত তাকওয়াই আল্লাহ তা'লাকে চিনিয়ে থাকে এবং তাঁর বিধিনিষেধের উপর আমলকারী বানায়।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৩২)

পুনরায় তিনি (আ.) নামায কী জিনিস এবং প্রকৃত নামায কেমন হওয়া উচিত এবং নামাযের প্রকৃত তত্ত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, এমন অনেকেই আছে যারা মুখে খোদা তা'লাকে মানে কিন্তু যাচাই করে দেখলে দেখা যাবে, তাদের হৃদয়ে নাস্তিকতা রয়েছে। কেননা জাগতিক কাজে যখন ব্যস্ত থাকে তখন তারা খোদা তা'লার ক্রোধ ও মাহত্মকে একেবারেই ভুলে বসে। তাই তোমরা দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তা'লার তত্ত্বজ্ঞান যাচনা কর; এটি অতি আবশ্যকীয় একটি বিষয়। তার প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস ততক্ষন পর্যন্ত অর্জন হতে পারেনা যতক্ষন পর্যন্ত না তার এই জ্ঞান হয় যে, আল্লাহ তা'লার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার মাঝে এক মৃত্যু নিহিত। পাপ থেকে বাঁচার জন্য দোয়ার পাশাপাশি চেষ্টাপ্রচেষ্টা করাও পরিত্যাগ করবে না। দোয়া করাও জরুরী আবার চেষ্টাপ্রচেষ্টা করাও আবশ্যক। আর যে সকল সভা এবং বৈঠকে অংশগ্রহণের ফলে পাপের প্ররোচনা জন্মে সেগুলো পরিহার করো। আমরা প্রত্যেকে নিজেরাই যাচাই করতে পারি যে, কোন্ কোন্ সভা, বৈঠক এবং টিভি এবং অন্যান্য মাধ্যমে এমন কোন্ অনুষ্ঠান রয়েছে যা পাপে প্রবৃত্ত করে? সেগুলোকে পরিত্যাগ করতে হবে। এগুলো পরিত্যাগ করার পাশাপাশি দোয়াও করতে থাকো। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের ফলেই সেগুলো তোমরা পরিত্যাগ করতে পারবে তাই এজন্য দোয়াও কর। আর ভালভাবে স্মরণ রাখ! মানুষ তকদীরের অধীনে যে সকল বিপদাপদের সম্মুখীন হয় তা থেকে খোদা তা'লার সাহায্য ব্যতিত কখনোই মুক্তি লাভ সম্ভব নয়। পাঁচবেলার নামাযের মধ্যেও এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা এবং ধ্যানধারণা থেকে মুক্ত না হবে তা প্রকৃত নামায হবে না। নামায কেবল মাটিতে মাথা ঠোঁকা কিংবা প্রথাগতভাবে নামায পড়াকে বলে না। সেটিই নামায যা হৃদয়ে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে, আর আত্মা বিগলিত হয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে খোদার দরবারে লুটিয়ে পড়ার নামই হলো নামায। সাধ্যানুযায়ী হৃদয়ে বিগলন সৃষ্টির চেষ্টা এবং আকুতি মিনতির সাথে যাচনা করা উচিত যাতে অন্তরের সকল আমিত্ব ও পঙ্কিলতা দূর হয়ে যায়। এ ধরণের নামাযই কল্যাণজনক হয়ে থাকে । কেউ যদি এর উপর দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকে তবে সে রাতে কিংবা দিনে একটি জ্যোতি তার হৃদয়ে এসে পড়তে দেখবে আর অবাধ্য আত্মার দৌরাত্ম হ্রাস পেয়েছে। যে অবাধ্য আত্মা মানুষকে পাপের দিকে প্ররোচিত করে তা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। যেরূপভাবে সাপের মাঝে ঘাতক বিষ রয়েছে ঠিক একইভাবে নফসে আম্মারার মাঝেও ঘাতক বিষ রয়েছে আর যিনি এটি সৃষ্টি করেছেন তার কাছেই এর চিকিৎসা রয়েছে।

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ১২৩)

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লার কাছেই এর চিকিৎসা রয়েছে। তাই প্রবৃত্তির ক্ষতিকর দিক এবং পাপকর্ম থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ্ তা'লার কাছেই তাঁর কৃপা যাচনা করা উচিত। অতঃপর নামাযের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, নামাযই ইবাদতের প্রাণ। এটি ছাড়া ইবাদতের দায়িত্ব পালিত হতে পারে না। এ জন্য সর্বদা স্বরণ রাখা উচিত যে, নামায ছাড়া কিংবা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশিত পন্থা ছাড়া যথাযথভাবে ইবাদত করা সম্ভব নয়। আর নামাযেরও কতিপয় আবশ্যকীয় দিক রয়েছে, কতিপয় শর্তাবলী রয়েছে, এগুলো পূর্ণ করাও জরুরি। নামাযে এ কথাও স্বরণ রাখা উচিত যে, আমি সশ্রদ্ধভাবে সাথে আল্লাহ্ তা'লার সামনে দন্ডায়মান হয়েছি। নামাযে যেন বিনয় ও পূর্ণ নিমগ্নতা থাকে আর তাঁর অনুগ্রহরাজী যাচনা করতে হবে। এই অবস্থার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, একবার আমি চিন্তা করলাম নামায এবং দোয়ার মাঝে পার্থক্য কী? হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, 'আস্সালাতু হিয়াদ্ দোয়া', আসসালাতু মুখখুল ইবাদাহ। অর্থাৎ, নামাযই হল দোয়া। নামায ইবাদতের মগজ বা প্রাণ। মানুষের দোয়া যখন কেবল নিছক পার্থিব বিষয়াদির জন্য হবে তখন এর নাম সালাত বা নামায নয়। মানুষ দোয়া করে, মসজিদে নামায পড়তে আসে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া শুরু করে, অনেক দোয়া করে, অনেক কাঁদে শুধুমাত্র পার্থিব সমস্যাদির নিষ্পত্তির জন্য। তিনি বলেন, তুমি যদি কেবলমাত্র পার্থিব স্বার্থে নামায আদায় কর তাহলে তাকে নামায বলা হয় না। কিন্তু যখন মানুষ খোদার সাথে সাক্ষাত করতে চায়, তার সন্তুষ্টিকে দৃষ্টিপটে রাখে এবং শিষ্টাচার, বিনয় এবং নম্রতা এবং গভীর নিমগ্নতার সাথে আল্লাহ্তা'লার সামনে দণ্ডায়মান হয়ে তার সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে, নিজের স্বার্থসিদ্ধির দোয়া না করে বরং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায়, সেটিই সালাত হিসাবে গণ্য হয়। প্রকৃত অর্থে সারগর্ভ দোয়া সেটি যার মাধ্যমে খোদা এবং মানুষের মাঝে সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। এই দোয়াই আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের মাধ্যম হয়ে থাকে আর মানুষকে অযৌক্তিক বিষয়াদী থেকে দূরে রাখে। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করাই হলো আসল কথা এরপর পার্থিব অন্যান্য প্রয়োজনাদির জন্য দোয়া করা বৈধ। প্রথমে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য দোয়া কর, এরপর জাগতিক প্রয়োজনেও দোয়া কর। কেননা তা-ও আল্লাহ্ তা'লার কৃপাবলেই লাভ হয়ে থাকে। এটি বৈধ করার কারণ হলো অনেক সময় পার্থিব সমস্যাদি ধর্মীয় বিষয়ে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে অবক্ষয় ও বক্রতার যুগে এগুলো হোঁচট খাওয়ার কারণ হয়ে থাকে। অর্থাৎ দুর্বলতার কারণে পার্থিব বিষয়াদী হোচট খাওয়ার কারণ হয়ে যায়। আর এজন্য আল্লাহ্ তা'লার সাথে প্রথমে প্রেমবন্ধন সৃষ্টি কর, এরপর পার্থিব বিষয়াদী সমাধানের

জন্যও দোয়া কর। তিনি বলেন, সালাত শব্দটি প্রদাহ ও বিগলনের অর্থ দিয়ে থাকে। যেভাবে আগুন থেকে উত্তাপ সৃষ্টি হয়, সেভাবেই দোয়ার মাঝে এমন একটি বিগলন সৃষ্টি হওয়া চাই। মৃতবৎ অবস্থায় যদি মানুষ পৌঁছে যায় তবেই এর নাম সালাত রাখা যেতে পারে।

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৩৬৭-৩৬৮)

অতএব এটি হল নামাযের প্রকৃত চিত্র, যাঅর্জন করার জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিকও দান করুন।

অতপর এক স্থানে তিনি (আ.) এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলেন, স্মরণ রেখো, যদি ঈমান আনার দাবি থেকে থাকে তাহলে নামায আদায় করাও আবশ্যক। তিন ওয়াক্ত বা চার ওয়াক্ত নামায আদায় করে এরপর ঈমানদার হওয়ার দাবি করা অর্থহীন;যেমনটি কতিপয় লোক করে থাকে, কেননা ঈমানের মূল হল নামায। আর যার মূলই নেই তা এক অন্তঃসারশূন্য বৃ ক্ষের ন্যায়, যা সামান্য বাতাসেই ভূলুণ্ঠিত হবে। তিনি (আ.) বলেন, যেভাবে অতিমাত্রায় গরমের ফলে আকাশে মেঘমালা একত্রিত হয় আর বৃষ্টি বর্ষণের সময় এসে যায়, একইভাবে মানুষের দোয়া ঈমানী উত্তাপ সৃষ্টি করে আর তার লক্ষ্য অর্জন হয়ে যায়। নামায হল সে অবস্থা যেখানে মানুষ অত্যন্ত বিগলিত চিত্তে এবং বিনয় ও শিষ্টাচারের সাথে খোদা তা'লার দরবারে দণ্ডায়মান হয়। মানুষ যখন বান্দা হয়ে উদাসীনতা দেখায়, সেক্ষেত্রে আল্লাহ তা'লার সত্তাও অমুখাপেক্ষি, তিনিও কারো পরোয়া করেন না। প্রত্যেক উম্মত বা জাতি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকে যতক্ষণ তারা খোদার প্রতি মনোযোগী থাকে। ঈমানের মূল হল নামায। কতক নির্বোধ বলে থাকে যে, আমাদের নামায আল্লাহ্র কী কাজে লাগবে? তিনি বলেন, হে নির্বোধেরা ! খোদার কোন প্রয়োজন নেই একথা সত্য, কিন্তু তোমাদের তো প্রয়োজন রয়েছে। তোমাদের নামাযের প্রয়োজন রয়েছে যেন খোদা তা'লা তোমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করেন। খোদার কৃপাদৃষ্টির ফলে সকল বিশৃঙ্খল কাজ সুশৃঙ্খল হয়ে যায়। নামায অসংখ্য পাপ দূরীভূত করে এবং খোদার নৈকট্য লাভের মাধ্যম।

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৩৭৮)

আর শুধুমাত্র এতটুকুই নয় যে, নামাযের মাধ্যমে খোদার নৈকট্য লাভ হয়, পাপ মোচন হয় এবং বিশৃঙ্খল কাজ সুশৃঙ্খল হয় বরং পুণ্যের নিয়্যতে মসজিদে আগমণকারী এবং বসে নামাযের জন্য অপেক্ষমানদের সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত নামাযের অপেক্ষায় কেউ মসজিদে বসে থাকে, তাকে নামাযরতই গণ্য করা হয়। মসজিদে বসে থাকা এবং সেখানে যিকরে এলাহীরত অবস্থাকে নামাযরত অবস্থা হিসেবে গণ্য করা হয়। আর ফেরেশতারা তার প্রতি দরূদ প্রেরণ করতে থাকে এবং বলে, হে আল্লাহ! তার প্রতি কৃপা কর এবং তাকে ক্ষমা করে দাও, তার তওবা গ্রহণ কর।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ)

অতএব, মসজিদে এসে নামায আদায়কারীদের জন্য কত বড় পুরষ্কার! শুধু নামায আদায়ের জন্য-ই নয় বরং অপেক্ষা করার জন্যও আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে পুণ্য লাভ করে এবং ফেরেশতারাও তার জন্য দোয়া করে।

সুতরাং (ভেবে দেখুন) এমন কৃপালু খোদার ইবাদত যথাযথভাবে করার জন্য আমাদেরকে কতটা সচেতনতার সাথে চেষ্টা করা উচিত এবং পাঁচ বেলা নামাযে মসজিদ আবাদ রাখার চেষ্টা করা উচিত! ধর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐক্য সৃষ্টি করা, এক জাতি বানানো- এই বিষয়টিকে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছা হলো, সকল মানুষকে এক-দেহ এক-প্রাণ তুল্য বানিয়ে দেওয়া যার নাম হবে গণঐক্য। যার অধীনে এক বিশাল জনগোষ্ঠী একব্যক্তি পরিগণিত হয়। অনেকে একসাথে মিলিত হয় আর সবাই মিলে একজন মানুষ হয়ে যায়। ধর্মের উদ্দেশ্যও এটি অর্থাৎ তসবিহ্ দানার ন্যায় এক মালায় সবার গ্রথিত হওয়া। এই যে বাজামাত নামায পড়া হয় তাও এই এক্যের জন্য, যাতে করে সব নামাযিদেরকে একটি সত্ত্বা হিসেবে গন্য করা যায়। আর পরস্পর একসাথে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেওয়ার কারণ হলো, যার কাছে বেশি জ্যোতি আছে তা যেন অপর দূর্বল ব্যক্তির মাঝে সঞ্চারিত হয়ে তাকে শক্তি দান করে। এমনকি হজ্জও এই একই উদ্দেশ্যে। এই জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি এবং এটিকে প্রতিষ্ঠিত রাখার সূচনা আল্লাহ্ তা'লা এভাবে করেছেন, প্রথমে এই নির্দেশ দিয়েছেন, প্রত্যেক এলাকাবাসী পাঁচ ওয়াক্তের নামায পাড়ার মসজিদে বাজামাত আদায় করবে, যাতে করে নিজেদের মধ্যকার সদগুণের পরস্পরের মাঝে বিনিময় ঘটে এবং সকল আলো জ্যোতি সম্মিলিত হয়ে দূর্বলতা দূর করে এবং একে অপরের সাথে পরিচিত হয়ে যেন পারস্পারিক ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। পরিচিতি একটি চমৎকার জিনিস, কেননা এর মাধ্যমে হৃদ্যতা বৃদ্ধি পায় যা ঐক্যের মূল ভিত্তি। এমনকি একজন পরিচিত শত্রু একজন অপরিচিত বন্ধু অপেক্ষা অধিক উত্তম হয়ে থাকে। কেননা বিদেশে যখন পরস্পর সাক্ষাৎ হয় তখন পরিচিতির কারণে হৃদয়ে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। এর কারণ কারণ হলো, বিদ্বেষের স্থান থেকে দূরে যাওয়ার কারণে বিদ্বেষ যা একটি সাময়িক বিষয় হয়ে থাকে তা দূর হয়ে যায় এবং শুধু পরিচিতিটাই অবশিষ্ট থাকে। এরপর দ্বিতীয় নির্দেশ হলো, জুমুআর দিন যেন জামে মসজিদে একত্রিত হয়। কেননা একটি শহরের সব লোকের প্রতিদিন একত্রিত হওয়া কঠিন। এজন্য প্রস্তাব হলো শহরের সকল লোক সপ্তাহে একদিন মিলিত হয়ে যেন পরিচিতি ও এক্য দৃঢ় করে।

এখানে দূরত্ব বেশী হলেও যাদের বাহনের সুবিধা রয়েছে তাই তাদের জন্য প্রতিদিন মসজিদে আসাটাও এমন কোন কঠিন কাজ নয়; তারা আসতে পারেন। ইচ্ছা থাকলে মসজিদ আবাদ করার জন্য আসা সম্ভব। কিন্তু বলা হয়েছে, লোকজন অনেক দূরে থাকলে আর অপারগতাও থাকে; তবুও জুম'আতে তো অবশ্যই আসতে হবে। অবশেষে একসময় সবাই একত্রিত হবে। এরপর বছরান্তে দু'ঈদে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, গ্রাম ও শহরের লোকজন একত্রে যেন নামায আদায় করে যাতে করে পরিচয় এবং ভালবাসা বৃদ্ধি পেয়ে জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি হয়। একইভাবে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের জন্য জীবনে এক দিন নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে মক্কার প্রান্তরে সকলে সমবেত হবে; অর্থাৎ সামর্থবান ব্যক্তিরা যেন হজ্জে যোগদান করে। বস্তুত এভাবে আল্লাহ্ তা'লা চেয়েছেন যেন পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। তিনি (আ.) তাঁর বিরোধীদের বিশেষত ইসলাম বিরোধীদের সম্পর্কে বলছেন যে, তারা জানে না, ইসলামের দর্শন কতটা পরিপক্ক। তারা জানেই না অথচ কথায় কথায় আপত্তি করতেই থাকে। ইবাদত সম্বন্ধে আপত্তি করে যে, পাঁচ বেলা ইবাদতের কী উদ্দেশ্য? প্রত্যেক সপ্তাহে ইবাদতের উদ্দেশ্য কী? ঈদ ও অন্যান্য ইবাদতের উদ্দেশ্য কী? তিনি (আ.) বলছেন, এই হলেআসল দর্শন আর এই দর্শন মনে রাখা প্রয়োজন। তিনি (আ.) বর্ণনা বলেন, ঐশী বিধিবিধান পালনে উদাসীনতা এটি থেকে সম্পূর্ণভাবে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া কখনো সম্ভবই নয়। এমন কোন মুসলমান আছে? (যার পক্ষে একাজ সম্ভব)। তিনি (আ.) বলেন, পরিতাপ; তারা জানে না যে ইসলামী নীতি-দর্শন কতটা পরিপক্ক। জাগতিক শাসকদের পক্ষ থেকে যেসব বিধিনিষেধ দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে মানুষ সর্বদা উদাসীন হতে পারে কিন্তু ঐশী বিধিবিধান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন এবং সম্পূর্ণভাবে অবাধ্যতা করা কখনো সম্ভবই নয়। এমন কোন্ মুসলমান আছে যে কমপক্ষে ঈদের নামায পড়ে না? অতএব এসব সমাবেশ বা সম্মেলনের উপকারিতা হলো, একজনের আধ্যাত্মিক জ্যোতি অপরের মাঝে সঞ্চারিত হয়ে তাকে শক্তি দান করে।

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ১২৯-১৩০)

পারস্পরিক মেলামেশার ফলে যা-ই হোক, প্রভাব পড়ে; কিন্তু এসব কথাতো তাদের জন্য যারা ঈমানের ক্ষেত্রে একেবারেই দুর্বল। কিন্তু নামাযের উদ্দেশ্যে পাঁচ বেলা মসজিদে আসাই হলো, প্রকৃত ঈমান। আল্লাহ তা'লা যেহেতু আপনাদেরকে একটি মসজিদ দিয়েছেন, তাই যাদের সফরের সুযোগ আছে তা কাজে লাগিয়ে আপনাদের উচিত এই মসজিদে একত্রিত হয়ে সেই ঐক্যের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা। আল্লাহ তায়ালার এই অশেষ কৃপা থেকে উপকৃত হয়ে এই মসজিদকে আবাদ রাখুন । এমনটি করলে আল্লাহতা'লাও কৃপা বর্ষণ করবেন। যেমন আমি এক্ষণি উল্লেখ করেছি,

দোয়াপ্রার্থী: Sk Hatem Ali, Uttar Hajipur, Diamond Harbour

যুগ খলীফার বাণী

আল্লাহ্র সামনে নতজানু হওয়াই হল বিপদাপদপূর্ণ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ । (খুতবা জুমা প্রদত্ত,১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: Anowar Ali, Jamat Ahmadiyya Abhaipuri (Assam)

যারা পাঁচ বেলা নামায পড়তে মসজিদে আসেন, আল্লাহতায়ালা তাদের পক্ষে দোয়া করার জন্য ফেরেশতা নিয়োজিত করেন। আর বাজামাত নামায পড়ার পূণ্য আল্লাহতায়ালা ২৭ গুণ বেশি নির্ধারণ করে রেখেছেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল আযান, বাবু ফাযলুস সালাত, হাদীস-৬৪৫)

অতএব, আল্লাহতায়ালার কৃপার এমন দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও, সু যোগ থাকা সত্ত্বেও আমরা যদি এর মুল্যায়ন না করি, তাহলে এটি আমাদের দুর্ভাগ্য। প্রত্যেক আহমদীর জন্য এটি গভীর চিন্তা বিষয়। আর এক বিশেষ সচেতনতার সাথে মসজিদ আবাদ করা প্রয়োজন। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এক স্থানে বলেন:

"হে যারা নিজেদেরকে আমার জামাতের সদস্য বলে মনে কর, তোমরা উর্দ্ধলোকে কেবলমাত্র তখনই আমার জামাতের সদস্য বলে গণ্য হবে যখন তোমরা প্রকৃতপক্ষে খোদাভীতির পথ অবলম্বন করবে। অতএব নিজেদের পাঁচ বেলার নামায এতটা বিণয় ও ভীতির সাথে আদায় করো, যেন তোমরা আল্লাহতায়ালা কে স্বয়ং দেখতে পাচ্ছ। আর তোমাদের রোযাসমূহ আল্লাহতায়ালার জন্য সততার সাথে পূরণ করো। যাদের উপর যাকাত বর্তায় তারা যেন যাকাত আদায় করেআর যাদের জন্য হজ্ব পালন করা ফরজ(অর্থাৎ হজ্ব করার শর্তসমূহ পূর্ণ) হয়েছে আর কোন প্রতিবন্ধকতা নেই, তারা যেন হজ্ব পালন করে। পুণ্য কর্মগুলো আন্তরিক ভাবে করো আর পাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে সেগুলো পরিত্যাগ করো। স্বরণ রেখ, তাকওয়াশূন্যকোন পূণ্যকর্ম আল্লাহতায়ালার নিকট গৃহীত হয়না। প্রত্যেক পূণ্য কর্মের মূল ভিত্তি হলো তাকওয়া। যেই কর্মের এই মূল নষ্ট হবে না, সেই পূণ্য কর্ম কখনও বিনষ্ট হবেনা। তিনি বলেন, তোমাদের ক্ষতি তোমাদের নিজেদের হাতেই হবে, শত্রুদের হাতে নয়। যদি তোমাদের পার্থিব সব সম্মান বিনষ্ট হয় তবে খোদা আকাশে তোমাদেরকে এক স্থায়ী সম্মান দান করবেন। অতএব, তোমরা এটি পরিত্যাগ করো না। তোমরা খোদা তা'লার শেষ জামা'ত, অতএব তোমরা এমন পূণ্যকাজ প্রদর্শন কর যা উৎকর্ষে চূড়ান্ত পর্যায়ের। তোমাদের মধ্যে যে-ই অলস হবে সে-ই নোংরা বস্তুর ন্যায় জামাতের বাইরে নিক্ষিপ্ত হবে এবং সে অনুতাপ করে মরবে। সে খোদা তা'লার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। দেখ আমি অতীব আনন্দের সাথে সংবাদ দিচ্ছি যে, তোমাদের খোদা প্রকৃতই বিদ্যমান আছেন। যদিও সব তাঁরই সৃষ্ট কিন্তু তিনি সেই ব্যক্তিকে বেছে নেন যে তাঁকে বেছে নেয়, তিনি ঐ ব্যক্তির কাছে আসেন যে তাঁর কাছে যায়। যে তাকে সম্মান করে তিনিও তাকে সম্মানিত করেন অর্থাৎ মানুষকে। "

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ১৫-১৯)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর এই আবেগঘন কথাগুলো অনুধাবন করে ঈমানে উন্নতি করার সৌভাগ্য দান করুন। যথাযথভাবে ইবাদত করার সৌভাগ্য দান করুন। খোদা তা'লার সাথে জীবন্ত সম্পর্ক সৃষ্টি করার সৌভাগ্য দান করুন। আমরা যেন এ মসজিদকেও সর্বদা আবাদ রাখতে পারি।

এখন আমি মসজিদ সম্পর্কে কিছু তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করছি। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় কয়েক বছর পূর্বে এ মসজিদ নির্মাণের চেষ্টা শুরু হয়। এরপর আল্লাহ্ তা'লা এই জায়গা দান করেছেন যা সর্বসাকুল্যে ২৬৪০ বর্গ মিটার। এতে পূর্বেও পনের কক্ষ বিশিষ্ট একটি তিন তলা ভবন ছিল, একটি বড় হলও ছিল। এটি ক্রয়ের জন্য কেন্দ্র থেকে কিছু অর্থ কর্যা হাসানা (উত্তম ঋণ) স্বরুপ নেওয়া হয়েছিল। আমীর সাহেব বলেন তা থেকে পঞ্চাশ হাজার ইউরো ব্যতীত প্রায় পুরোটাই পরিশোধ হয়ে গেছে। কাউন্সিলের কিছু আপত্তি ছিল তা বিভিন্ন বৈঠক করে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। মেয়রের সাথে কয়েকবার মিটিং করে নকশাসমূহ্ জমা করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এ নকশাও অনুমোদিত হয়েছে। এটি নির্মানের ব্যাপারে তাদের যে নকশা ও পরিকল্পনা ছিল সে রিপোর্ট অনুযায়ী আর্কি টেক্ট এক মিলিয়ন ইউরো ব্যয় হবে বলে ধারনা দিয়েছিল। আর মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া ফ্রান্স এই ব্যয়ভারবহনকরার অঙ্গীকার করেছে এবং এ দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে নিয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মসজিদ পাঁচ লক্ষ ত্রিশ হাজার ইউরোতে নির্মাণ সম্পন্ন হয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত খোদ্দামুল আহমদীয়ার পক্ষ থেকে সাড়ে তিন লক্ষ ইউরো পরিশোধ করা হয়েছে বাকি অর্থ জামাত দিয়েছে। খোদ্দামুল আহমদীয়া বলছে যে, বাকি ইউরোও আমরা পরিশোধ করে দিব। কিন্তু খোদ্দামুল আহমদীয়া তো পরিশোধ করছে আর সম্ভবত সম্পূর্ণ পরিশোধ করে দিবে। ইনশাআল্লাহ। সম্ভবত নয় ইনশাআল্লাহ্ তারা সম্পূর্ণ পরিশোধ করে দিবে। কিন্তু জামাতের অন্যান্যরা কেন এ থেকে বঞ্চিত থাকবে। এই মসজিদটির নির্মাণ কাজ তো শেষ হলো। এখন লাজনা ও আনসারদের আরেকটি মসজিদ বানানোর দায়িত্ব নেওয়া উচিত। তারা মিলে যেন এই দায়িত্ব নেয়। আগামী তিন বছরের মধ্যে লাজনা ও আনসারদের সম্মিলিতভাবে এখানে আরেকটি মসজিদ বানানো উচিত। এই মসজিদ নির্মানের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কমিটির সদস্য ছিলেন মোকাররম আসলাম দুউরি সাহেব, শেহবায সাহেব, মোহাম্মদ আসেম সাহেব ও মানসুর সাহেব যারা রিপোর্টে অনুসারে অসাধারণ পরিশ্রম করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন।

কাউন্সিলের হিসাব অনুযায়ী মসজিদটিতে ২৫০ জন মুসল্লির নামায পড়ার স্থান এবং পঞ্চাশটি গাড়ি পার্কিং এর জায়গা রয়েছে, অফিসকক্ষ রয়েছে, লাজনাদেরও একটি অফিস রয়েছে, পুরুষ ও মহিলাদের জন্য লাইব্রেরীও রয়েছে অনুরুপভাবে পর্যাপ্ত গোসল খানা ইত্যাদিও রয়েছে।অনেক বড় ছাদঢাকা পার্কিং হলও রয়েছে। যদি কখনো ইমার্জেন্সি দেখা দেয়, সেখানেও ১২৫ জন লোকের সংকুলান হতে পারে। পূর্বে যেই বিল্ডিং ছিল সেখানে ১৫ টি কক্ষ রয়েছে। সেগুলো পুনঃসংস্কার করে ব্যবহার যোগ্য করা হয়েছে।

এই মসজিদটি স্ট্রাসবার্গ শহর থেকে ১৫ কি.মি.দুরত্বে অবস্থিত। আর এটি তেমন কোন দুরত্ব নয় যে, নামাযীরা আসতে পারবে না বরং সহজেই আসতে পারবেন। মসজিদ এবং হলগুলোর ছাদঢাকা বা আচ্ছাদিত অংশ হচ্ছে তিনশত তিন বর্গমিটার। মুরুব্বি হাউজও রয়েছে যেখানে চার কক্ষ বিশিষ্ট গেস্ট হাউজও রয়েছে। নিয়মতান্ত্রিক মিনারের অনুমতি পাওয়া যায় নি তবে মসজিদের ডান দিকে আট মি. উচ্চতার একটি ডোম রাখার অনুমতি রয়েছে আর সেটিখুবই সুন্দর দেখায়। সেটি মসজিদেরই একটি অংশ, যার ভিতরে মেহরাবও রয়েছে। ভেতরের দিকে গোলকের মধ্যে লেখাও রয়েছে। আল্লাহ তা'লা সার্বিকভাবে এটিকে কল্যানমণ্ডিত করুন এবং সেসব খোদ্দামদের ধন ও জনসম্পদে বরকত দিন যারা এই মসজিদ নির্মানে কুরবানি করেছেন। আর মসজিদ নির্মানে আর্থিক কুরবানির পাশাপাশি মসজিদ আবাদ করার প্রেরণা উপলব্ধি করার সৌভাগ্য আল্লাহ তা'লা দান করুন। খোদ্দাম এবং জামাতের সকল সদস্যদের ইবাদতের মানও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাক। আমীন। **********

জলসা সালানা কাদিয়ান প্রসঙ্গে জরুরী ঘোষণা

২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিতব্য কাদিয়ানের সালানা জলসার বিষয়ে বদর পত্রিকায় ঘোষণা হয়ে এসেছে যে এটি ১২৫তম জলসা। এই ঐতিহাসিক জলসার প্রেক্ষিতে হুযুর আনোয়ার (আই.) কিছু বিশেষ অনুষ্ঠানের মঞ্জুরী প্রদান করেছেন, যেগুলি সম্পর্কে জামাতগুলিকে বিজ্ঞপ্তি আকারে সংবাদ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

এরই মাঝে 'তারিখে আহমদীয়াত কাদিয়ান' (ইতিহাস বিভাগ)-এর তদন্ত ও পর্যালোচনার আলোকে সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে এই তথ্য উপস্থাপন করা হয় যে-

২০১৯ সালে অনুষ্ঠিতব্য জলসা ১২৫তম সালানা জলসা নয়, বরং ১২৬তম সালানা জলসা।

হুযুর আনোয়ার (আই.) এর মঞ্জুরী প্রদান করেন এবং অনুষ্ঠানগুলিও অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেন। পাঠকবর্গকে এবিষয়ে অবহিত করা হল।

(ভারপ্রাপ্ত নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ মরকাযিয়া)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হৃদয়াঙ্গম করে সে ধনী, তার কোনও প্রকার দারিদ্রের আশঙ্কা নেই।

(সুনান সঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa, Amir Murshidabad District

খলীফার বাণী

নিজেদের আনুগত্যের মানকে উন্নত করা মোমেনদের জন্য একান্ত জরুরী।

(খুতবা জুমা প্রদত্ত ২৪শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Jahan Begum, Jamat Ahmadiyya kolkata

বর্তমানে পৃথিবীর শান্তি আমাদের সামনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয়।

সমগ্র মানবজাতিকে জাতি, ধর্ম ও বর্ণের উর্দ্ধে এসে শান্তি, সম্প্রীতি, সহনশীলতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ন্যায় মৌলিক মানবীয় মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

যে দেশ অভিবাসীদের স্বীকার করেছে সেই দেশের সঙ্গে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রাখা এবং নিজের যাবতীয় শক্তি-সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে সে দেশের উন্নতি ও সফলতার জন্য সহায়তা করা প্রত্যেক মুসলমান অভিবাসীর কর্তব্য।

সুইডেনের রাজধানী স্টক হোমে ১৭ ই মে ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত একটি অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) -এর ভাষণ

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এই সংক্ষিপ্ত সময়ে আমি কেবল কয়েকটি উদাহরণ উপস্থাপন করলাম যদ্বরা প্রমাণিত হয় যে, আপনারা মিডিয়ায় যেটিকে ইসলাম বলে প্রচার করছেন সেটি ইসলাম নয়। নাউযুবিল্লাহ কুরআন কোন উগ্রপন্থা প্রচারের পুস্তক নয় বরং কুরআন প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা ও মানবতার শিক্ষা দান করে। যদি মুসলমানরা নিজেদের ধর্মের প্রকৃত শিক্ষার উপর অনুশীলন করত, তাদের দেশে কোন গৃহযুদ্ধ ও সংঘর্ষ বাধত না আর তাদের সমস্যাগুলি অন্যান্য দেশগুলিকেও প্রভাবিত করত না।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: অতএব আমরা যদি ইসলামের প্রকৃত চিত্র দেখতে চাই তবে মহানবী হযরত রসুলুল্লাহ (সা.) এবং তাঁর খলীফার যুগকে দেখতে হবে। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত উচ্চ পর্যায়ের আদর্শ প্রমাণ করে যে, ইসলাম শান্তি ও ন্যায়ের জন্য একটি প্রদীপ যা বিশ্বে ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার নিশ্চায়তা প্রদান করে। উদাহরণ স্বরূপ দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.) -এর যুগে ইসলাম সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে যেখানে মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু রোমান আক্রমণের ফলে মুসলমানরা বাধ্য হয়ে দেশ ত্যাগ করে। ইতিহাস এই ঘটনার সাক্ষ্য বহন করে যে, যখন মুসলমানরা সিরিয়া থেকে চলে যাচ্ছিল তখন সেখানকার খ্রীষ্টান বাসিন্দারা তাদেরকে অশ্রুসিক্ত নয়নে তাদেরকে বিদায় জানাচ্ছিল। এবং অত্যন্ত ব্যকুল চিত্তে মুসলমানদের প্রত্যাবর্তনের জন্য দোয়া করছিল। কেননা তারা প্রত্যক্ষ্য করেছিল যে, মুসলমান প্রশাসকগণ কিভাবে তাদের অধিকার রক্ষা করে এসেছিল। অতএব এটি অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, বর্তমান যুগে মুসলমান প্রশাসন ও নেতৃবর্গ নিজেদের ধর্মের প্রকৃত শিক্ষাকে ভুলে বসেছে এবং তারা কেবল নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং ক্ষমতা নিয়েই চিন্তিত। তাদের অত্যাচার ও নীপিড়নের কারণে স্থানীয়দের মধ্যে হতাশা ও অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, উগ্রপন্থী সংগঠনগুলি যার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যাইহোক এই সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে বৃহতশক্তি ও বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানগুলির দায়িত্ব হল তারা যেন সর্বদা ন্যায়ের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়। যেখানেই কোন বিবাদের সূত্রপাত হয় সেখানে রাষ্ট্রপুঞ্জ-এর ন্যায় আন্তর্জাতিক সংগঠনকে নিরপেক্ষ ভুমিক গ্রহণ করা উচিত। এবং তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং উভয় পক্ষের মধ্যে উদ্ভুত মতানৈক্যের অবসান ঘটানো। বস্তুতঃপক্ষে কতিপয় দেশ ও গোষ্ঠীসমূহ যদি অতীতে ন্যায়-নীতি অবলম্বন করত, তবে বর্তমানে বিরাজমান অস্থিরতা পরিলক্ষিত হত না। আর এই শরণার্থীর সংকটেরও মুখোমুখী হতে হত না।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: কুরআন করীমে সুরা মুমেনুন-এর ৯ নং আয়াতে আরও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী নীতির বর্ণনা করা হয়েছে। যেখানে বর্ণিত হয়েছে যে- "প্রকৃত মুসলমান সেই যে নিজের অঙ্গিকার ও আমানতসমূহ রক্ষা করার প্রতি যত্নবান থাকে"। অর্থাৎ যে দায়িত্বাবলী তাদের উপর ন্যস্ত করা হয় তারা সেগুলিকে পালনের চেষ্টা করে। আমার মতে এই নীতি কেবল মুসলমানদের জন্যই নয় সমস্ত দেশ ও জাতির জন্য একটি বিশ্বজনীন-নীতি। দেশসমূহ ও আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলির উপর কিছু আমানত রয়েছে। তাদের নেতৃবৃন্দের কর্তব্য হল সততা, বিশ্বস্ততা ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে সেই দায়িত্ব পালন করা। প্রশাসন ও রাজনিতিকদের দায়িত্ব হল জনসাধারণের সেবা করা এবং জাতির ভবিষ্যত রক্ষা করা। তারা এই দায়িত্বকে যেন কোন সাধারণ বিষয় মনে না করে। অনুরূপভাবে রাষ্ট্রপুঞ্জের ভবিষ্যত নীতির মধ্যে একটি এবং এই প্রতিষ্ঠানের মৌলিক উদ্দেশ্য হল ভবিষ্যত প্রজন্মকে যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করা এবং পরস্পর শান্তিতে বসবাস করা এবং বিশ্ব- শান্তি প্রতিষ্ঠিত রাখা। তাদের নীতি স্পষ্টরূপে ঘোষণা করে যে, এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে একটি হল মানবজাতিকে ঐ সকল ভুল-ত্রুটি থেকে রক্ষা করা যার ফলে বিংশ শতাব্দীতে দু'টি বিশ্ব-যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অতএব এই দায়িত্বকে দৃষ্টিপটে রেখে রাষ্ট্রপুঞ্জকে নিজের মহান উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার চেষ্টা করা উচিত। এবং শান্তির গুরুত্ব অনুধাবন করার মাধ্যমে সেটিকে বর্তমান যুগের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে গণ্য করা উচিত। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল এই দায়িত্বটিকে উপেক্ষা করা হচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমি পুনরায় বলছি যে, যদি সমস্ত পক্ষ নিজেদের দায়িত্ব বুঝে নেয় এবং ন্যায়-নীতি অবলম্বন করে পরস্পরের অধিকার প্রদানের প্রতি যত্নবান হয় তবে এখনও সময় আছে, যুদ্ধ-বিগ্রহের ঘোর দুযোর্গ যা আমাদের শিয়রে অপেক্ষা করছে তার থেকে পরিত্রাণ লাভ সম্ভব হতে পারে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমি বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলিকে আরও একবার বলতে চাই যে, আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠা সহকারে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ণ চেষ্টা করুন। আল্লাহ তা'লা পৃথিবীবাসীকে প্রজ্ঞা দান করুন এবং মানবজাতির বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে ব্যক্তিগত স্বার্থাবলীকে ত্যাগ করার তৌফিক দিন। যদি আমরা এমনটি করতে অসফল হই, তবে যেরূপ আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, পৃথিবী তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের দিকে দ্রুততার সাথে ধাবিত হচ্ছে যার প্রভাব ভবিষ্যত প্রজন্ম পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। কেননা, অনেকগুলি দেশের কাছে পরমাণু বোমা আছে। এই যুদ্ধের পরিণাম আমাদের কল্পনাতীত। অতএব আমাদের নিজেদেরকে প্রশ্ন করতে হবে যে, আমরা কি আমাদের সন্তান-সন্ততিদের জন্য একটি উন্নত ভবিষ্যত রেখে যেতে চাই, নাকি তাদেরকে যুদ্ধ-বিগ্রহ, রক্তপাত এবং একটি বর্ণনাতীত যন্ত্রনার উত্তরাধিকারী করে যেতে চাই?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আল্লাহ তা'লা মানবতাকে রক্ষা করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করুন। আমরা সকলে পরস্পরেরক ন্যায়, প্রজ্ঞা ও কল্যাণ পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে মিলিত হই সেই তৌফিক দান করুন। যাতে আমরা এই যোগ্যতা অর্জন করতে পারি যে, নিজেদের সন্তানদের ভবিষ্যত রক্ষা করতে পারি। এই বলে আমি আপনাদের কাছে অনুমতি চাইব। আপনারকে সকলকে আমন্ত্রণ রক্ষার করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। আল্লাহ তা'লা আপনাদের সকলের উপর কৃপা করুক। অসংখ্য ধন্যবাদ।

হুযুর আনোয়ারকে পত্র লেখার নতুন ঠিকানা

জামাতের সদস্যগণ অবগত আছেন যে, জন্য সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ খামিস (আই.) কয়েক মাস থেকে মসজিদ ফযল থেকে নতুন কেন্দ্র ইসলামাবাদ, টিলফোর্ড স্থানান্তরিত হয়েছেন। যে সমস্ত সদস্য হুযুরকে ডাক যোগেদোয়ার পত্র লেখেন, তারা এখন থেকে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় চিঠি পাঠাবেন।

ISLAMABAD,2, SHEEPHATCH LANE,
TILFORD SURREY GU10 2AQ
UNITED KINDOM

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে **ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির যে সমাধিস্ত এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে।**

(সুনান আবু দাউদ)

দোয়াপ্রার্থী: **Begum Aseya Khatun, Hahari (Murshidabad)**

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: তোমাদের নিকট যখন কোন জাতির সম্মানীয় কোন ব্যক্তি আসে তখন তাকে যথাযোগ্য সম্মান দাও।

(সুনান ইবনে মাজা)

দোয়াপ্রার্থী: **Sabina Yasmin, Jamat Ahmadiyya Bilaspur (Chhattisgarh)**

কুরআন ও হাদিসের আলোকে খিলাফত

মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয়

সত্য যেখানে সুন্দরভাবে প্রকাশ পায় সেখানেই উৎসব। নিত্য পরমানন্দে আলুলায়িত ফেনীল সৎকার আমেজ পায় অননুদারের উজার করা সান্নিধ্যে। শত সহস্র লাখো-কোটি মু'মিনের প্রাণ শক্তিকে এক সূত্রে গাঁথবার মহান ব্রত খিলাফত নামক সংঘের। বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও মালায়ে আলার সাথে সাম্পর্ক স্থাপনের মহান উদ্দেশ্য খিলাফত প্রতিষ্ঠানকে দিয়েছে অনন্যসাধারণ মাত্রা। জীবনানন্দের প্রকান্ড উল্লাস আর রাতের আঁধারে গোপন অভিসারে মমতা ঝোরা অলকাশ্রম আহ্বান করে মু'মিনকে। খোদা তায়ালার অপার অনুগ্রহ লাভের আকাঙ্ক্ষার দোলচালে সক্রিয় ও সুদৃঢ় অবস্থান নিশ্চিত করে খিলাফত ব্যবস্থা। অমিয় সুধাদান আর সুরবাণীর সম্মিলনে মুখাতেব হন আল্লাহ্ জাল্লি জাললুহু। কবি কত সুন্দরই না বলেছেন"নিজেকে এতটাই উচ্চতায়/পূর্ণতায় নিয়ে যাও যেন, খোদা বান্দাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, বল! তোমার আকাঙ্ক্ষা কি?"

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহপাক বলেছেন "তোমাদের মধ্যে যারা ইমান আনবে ও সৎকর্ম করবে তাদের সাথে আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করেছেন যে, নিশ্চয় তিনি দুনিয়াতে তাদের মধ্যে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করবেন, যেভাবে তিনি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে এবং নিশ্চয় তিনি তাদের জন্য তাদের ধর্মকে সুদৃঢ় করবেন যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন। এবং তাদের ভীতির অবস্থার পরিবর্তে তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করবেন। তারাই আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। এরপরও যারা অবিশ্বাস করবে তারাই ফাসেক-দুষ্কৃতকারী।" (২৪:৫৬)।

এই আয়াতে করীমা আমাদের সামনে সুন্দরভাবে কয়েকটি বিষয় উপস্থাপন করেছে।

ক। ইমান আনয়নকারী ও সৎ কর্ম শীলদের মাঝে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করবেন।

খ। ধর্মকে খিলাফতের অনুসারীদের জন্য সুদৃঢ় করবেন।

গ। ভীতির অবস্থার পরিবর্তে নিরাপত্তা প্রদান করা হবে।

ঘ। সত্যিকার অর্থে তারাই ইবাদত গুযার (শিরককারী নয়) - যারা খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত।

ঙ। যারা খিলাফতের অস্বীকারকারী তারা ফাসেক।

প্রত্যেক নবীর সমসাময়িক যুগের অনুসারীরা সৎকর্মশীল হয়ে থাকেন। প্রথমে ইমানের জন্য তাদেরকে চরম মুখালেফাতের সম্মুখীন হতে হয়। সৎকর্ম শীল হতে গিয়ে ত্যাগ করতে হয় জীবনের সমস্ত অপকর্ম । অবশেষে আল্লাহর দয়ার সাগর উছলে উঠে। তিনি মানুষের আরো উন্নতিকল্পে নবীর মৃত্যুর পর খিলাফত পদ্ধতি চালু করেন। খিলাফতের মসনদে সমাসীন খলীফা নবীর অসম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে থাকেন। এমনকি অনেক ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার জন্য খিলাফতের ব্যবস্থাপনা অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে থাকে। সূরা নিসার ৭০ নং আয়াতে মহান আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন-

"এবং যারা আল্লাহ এবং এই রাসুলের আনুগত্য করবে তারা ঐ সকল লোকদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হবে যাদেরকে আল্লাহ পুরষ্কার দান করেছেন নবী এবং সিদ্দিক এবং শহীদ এবং সালেহগণের মধ্যে। এবং এরাই সঙ্গী হিসাবে উত্তম।"

এই যে, আধ্যাত্মিক পুরষ্কারের কথা মহান আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন এর মাধ্যমে মানুষের রূহানী স্তরকে এক মহান মোকাম দানের প্রতীতি করেছেন। মানুষের আনুগত্য, আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি দায়িত্বশীলতা, মানুষের প্রতি মানুষের দায়িত্ববোধ ও সম্প্রীতির ফল্গুধারা মানুষকে দান করতে পারে উচ্চ মোকাম। এই ঐশী ব্যবস্থাপনা দাবি করে, মানুষ যেন সত্যিকার অর্থে আশরাফুল মাখলুকাত হয়। এই চরম উৎকর্ষ সাধনের সাথে খিলাফতের প্রতিষ্ঠা অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। তাই এই পৃথিবীতে সরাসরি খোদার দিক-নির্দেশনা ও যু গোপযোগী সিদ্ধান্তলাভের জন্য খিলাফতের মতো মহান প্রতিষ্ঠান স্থাপনের যে খোদায়ী ইচ্ছা তার বাস্তবায়নের জন্য আমলকে সাজাতে হবে অপরূপ সাজে। এই পৃথিবীতে যদি মানুষ খোদাপ্রাপ্ত মানুষে পরিণত হতে চায় তাহলে খিলাফতের কোন বিকল্প নেই। এই ঐশী প্রস্রবণ মানুষকে পল্লবিত করে দিতে পারে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন- "হে (খোদা লাভে) বঞ্চিত ব্যক্তিগণ! এই প্রস্রবণের দিকে ধাবিত হও, ইহা তোমাদিগকে পল্লবিত করিয়া দিবে। ইহা জীবনের উৎস যাহা তোমাদিগকে সঞ্জীবিত করিবে। আমি কি করিব এবং কি উপায়ে এই সুসংবাদ তোমাদের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিব? মানুষের শ্রুতিগোচর করিবার জন্য কোন জয়ঢাক দিয়া বাজারে বন্দরে ঘোষণা করিব যে, "ইনি তোমাদের খোদা।" এবং কোন ঔষধ দ্বারা আমি চিকিৎসা করিব যাহাতে শুনিবার জন্য তাহাদের কর্ণ উন্মুক্ত হয়।"

(কিশতিয়ে নূহ; বাংলা চতুর্থ সংস্করণ; ২৫শে আগস্ট ১৯৯৬, পৃষ্ঠা:৩৪)

খোদা তায়ালার সাথে মানুষের সম্পর্ক স্থাপন হলেই কেবল খোদা তায়ালা এই পৃথিবীতে তাঁর মনোনীত ব্যক্তি দান করে সঞ্জীবণী সূধা প্রদানের ব্যবস্থা করেন। একথা কিভাবে আশা করা যায় যে, মানুষ খোদার সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে আর খোদা তায়ালা তাঁর প্রতিনিধি প্রেরণ করে তাদের উন্নতির ব্যবস্থা করবেন। মানুষের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে যখন মানুষ প্রয়াসী হয় তখন খোদা মানুষের একান্ত আপন হয়ে যায়। মনোনীত বা গ্রহণীয় ব্যক্তির হাত খোদার হাত হয়ে যায়, তার ইচ্ছা খোদার ইচ্ছায় পরিণত হয়। জীবাত্মা ও পরমাত্মার এই মিলনের অভিপ্রায় থেকেই জগতের সৃজন। ইবাদতের ঠাঁস বুনটে চিত্রায়িত হয় খোদা দর্শনের নকশী-কাঁথা। আমলের বিন্যাসে মালায়ে আলা থেকে ফিরিশ্তারাও আশীষ বর্ষণ করে। মানুষ যখনই সৎকর্মে উদ্বেলিত হয়, উচ্চকিত হয় তখনই খোদা তায়লার সামনে ফিরিশ্তারা খিলাফতের বিরোধিতার জন্য লজ্জিত হয়। আমাদের খোদা এমন এক খোদা যিনি সর্বাবস্থায় আমাদের সাথে থাকতে চান। কিন্তু সে নেয়ামতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হওয়ার জন্য আমাদের জীবনের প্রতিটি ধাপে উন্নতি করতে হবে সৎ পদচারণায়। এমন ব্যক্তিবর্গের প্রতি লক্ষ্য করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন- " খোদা এক প্রিয় সম্পদ; তোমরা তাঁর কদর কর।" (কিশতিয়ে নূহ; বাংলা চতুর্থ সংস্করণ; ২৫শে আগস্ট ১৯৯৬, পৃষ্টা:৩৪)।

খোদা প্রাপ্তির চরম মার্গ অর্জন করেছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে"অতঃপর সে (আলণ্ঢাহর) নিকটবর্তী হলো, তখন তিনিও (মুহাম্মদের প্রতি) নীচে নামলেন। অতঃপর সে দুই ধনুকের এক তন্ত্রী হয়ে গেল অথবা তা হতেও নিকটতর হয়ে গেল।" (৫৩:৯-১০)। পরিশীলিত অনুভবের ফ্রেমে বাঁধা জীবনাচারের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে কখনো জীবন পায় নতুন দিগন্তের দিশা। কখনো

"একটি ধানের শীষের উপর একটি শিশির বিন্দু"-ই হয়ে উঠে অত্যাশ্চর্যের ধন। নতুন অথচ চিরকালীন এই ভাবনা আর স্বীয় পূর্ব অবস্থানের মেলবন্ধন আয়াসসাধ্য না হলেও সহজসাধ্য নয়। জীবনের নানা মুহূর্ত নানা পরীক্ষা নিয়ে মানুষের সামনে হাজির হয়। তারপরও স্রষ্টা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা জানার পরও বার বার মানুষ হোঁচট খেয়েছে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেন-

"সেই সত্তা পরম বরকতের অধিকারী যিনি আপন বান্দার উপর আল-কুরআন অবতীর্ণ করেছেন যাতে করে সে সমগ্র জগতের জন্য সর্তককারী হতে পারে।" (২৫:২) । হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আয়নায়ে কামালাতে ইসলামে কতইনা সুন্দর করে বলেছেন "জীবন কি জিনিস? তাঁরই রাস্তয় প্রাণ বিসর্জন দেওয়া। স্বাধীনতা কি?

তাঁরই (সা.) কারাগারে শিকারের মত বন্দী হয়ে যাওয়া। "

সত্যিই তো! কত মহান শিক্ষা ইসলামের! পরিপূর্ণভাবে ইমান আনা মানেই নিজেকে আল্লাহ ও রাসুলের পথে উৎসর্গ করে দেওয়া। এর মাঝেই জীবনের কল্যাণ নিহিত। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মাধ্যমে খোদা তায়ালা প্রকটভাবে নিজেকে জগতের সামনে প্রকাশিত করেছেন। সেই রাসুলে খোদার আনুগত্য করলেই খিলাফতের মহান কল্যাণ লাভ করা সম্ভব হবে। আজ জগতের ভাগ্য হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মাধ্যমে খিলাফতের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। কারণ, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) ছিলেন অত্যুচ্চ নূর। তাঁর (সা.) মধ্যে খোদা বিভাসিত হতেন। সেই সরসীর (সা.) আরশিতে আল্লাহ তায়ালার দীদার লাভ হতো। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লিখেন"সর্বাপেক্ষা উচ্চস্তরের জ্যোতি -যা মানব তথা পূর্ণ মানবকে দেওয়া হয়েছে। উহা ফিরিশতাগণের মধ্যেও ছিল না, তারকা পুঞ্জিতে ও ছিল না, চন্দ্রে উহা ছিল না, সূর্যে উহা ছিল না, উহা ভূ-পৃষ্ঠ, সমুদ্রে ও নদী সমূহে ছিল না, উহা পদ্মরাগমণি ও নীলকান্ত মণিতে ছিল না; পান্না, হীরক ও মোতির মধ্যেও ছিল না, উহা পার্থিব ও নৈসর্গিক বস্তুতে ছিল না। উহা ছিল শুধু মানবের তথা পূর্ণ মানবের মধ্যে সর্বোচ্চ ও পূর্ণতম মহীয়ান ও গরীয়ান, আমাদের প্রভু সৈয়্যদুল আম্বিয়া, সৈয়্যদুল আহয়িয়া, মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এর মধ্যে।" (আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম; পৃষ্ঠা: ১৬০-১৬১; বাংলা রাসুলে আজম (সা.) এর অতুলনীয় শান ও মর্যাদা পুস্তক থেকে)।খোদা ও তাঁর রাসুল (সা.) এর যথাযথ মান্যতাকেই ঐশী পুরস্কারের শর্ত নির্ধারণ করা হয়েছে।

আর এর চরম মার্গ বা সৎপথ অবলম্বিত হচ্ছে কি-না তা প্রমাণের জন্য "খিলাফত আলা মিন হাজিহিন নবুওয়াত" পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে"-ই-যে মানদন্ড তা পূবেই সূরা নূরের ৫৬ নং আয়াত উদ্ধৃত করে প্রমাণ করা হয়েছে।

"আমরা হয়েছি শ্রেষ্ঠ উম্মত-তোমা হতেই হে শ্রেষ্ঠ রাসুল। তোমার অগ্রে পদার্পনেই আমরা আগে কদম বাড়িয়েছি।" (দুররে সামীন)। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ওফাতের পর এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে, মনে হচ্ছিল মুসলমান সমাজে এক ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়েছে। সবাই হতবিহ্বল হয়ে পড়েছিল। হযরত ওমর (রা.) খাপ থেকে খোলা তলোয়ার উঁচিয়ে ঘোষণা করলেন, "যে বলবে মুহাম্মদ (সা.) মারা গেছে তার গর্দান যাবে।" তিনি (রা.) আরো বলেন, যদি তাঁর (সা.) রূহ দেহ থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে থাকেও, তবে শুধুমাত্র হযরত মুসা (আ.) এর মত আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য গেছে, তা আবার ফিরে আসবে, এবং দুনিয়ার সব মুনাফেকদের মাথা চূর্ণ করে ছাড়বে।" এমনকি ওমরের (রা.) এই অবস্থা দেখে সাহাবারাও এই বিশ্বাস করতে শুরু করলেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) মারা যাননি। এমতাবস্থায় কিছু লোক হযরত আবু বকর (রা.) । কে দৌড়ে গিয়ে এই খবর দেয়। তিনি মসজিদে এসে উপস্থিত হলেন। কারো সাথে কোন কথা না বলে সরাসরি ভেতরে চলে গেলেন। তিনি হযরত আয়েশা (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলেন, "রাসুলুল্লাহ্ (সা.) কি ইন্তেকাল করেছেন? " জবাবে হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, হ্যাঁ। "এই কথা শুনে তিনি (সা.) হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পবিত্র মুখমন্ডল থেকে কাপড় সরালেন এবং তাঁর (সা.) কপালে চুমু দিলেন। এরপর বললেন-"আলণ্চাহ কখনো আপনার উপর দুটি মৃত্যুকে একত্রিত করবেন না।" অর্থাৎ এটা হতে পারে না যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) দৈহিকভাবে মৃত্যুবরণ করবেন আবার অন্যদিকে তাঁর শিক্ষায় শিক্ষিত জামাত ভুল ধারণায় নিপতিত হবে। হযরত আবু বকর (রা.) বাইরে এসে মিম্বরে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন- (তখনও হযরত উমুর (রা.) নগ্ন তরবারি নিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ানো এবং যে বলবে, তার (সা.) মৃত্যু হয়েছে তাঁর শিরোচ্ছেদ করবেন, সে সময় হযরত ওমর তাঁর কাপড় টেনে ধরলেন যেন কিছু না বলেন। হযরত আবু বকর (রা.) একটানে কাপড় ছাড়িয়ে নিয়ে আয়াত পাঠ করেন "এবং মুহাম্মদ কেবল একজন রাসুল। তাঁর পূর্বেকার সকল রাসুল গত হয়ে গেছেন। অতএব, সে যদি মৃত্যুবরণ করে অথবা নিহত হয়, তাহলে তোমরা কি তোমাদের গোঁড়ালির উপর (পূর্ববর্তী অবস্থায়) ফিরে যাবে?" (আলে ইমরান: ১৪৫)।

এই আয়াত পাঠ করে হযরত আবু বকর (রা.) বললেন"তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহর ইবাদত করতো তার মনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ তায়ালা চিরঞ্জীব; তাঁর উপর কখনোই মৃত্যুর প্রভাব পড়ে না এবং যে ব্যক্তি মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ (সা.) এর ইবাদত করতো, তাকে আমি বলে দিতে চাই যে, মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ (সা.) মারা গেছেন।" সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের আধ্যাত্মিক চক্ষু সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল। হযরত ওমর (রা.) এর হাত থেকে তলোয়ার খসে পড়লো। প্রসিদ্ধ কবি হাসসান বিন সাবেত আবৃত্তি করলেন- "হে মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ (সা.)! তুমি তো আমার নয়নের পুত্তলী ছিলে। আজ তোমার মৃত্যুতে আমার চোখ অন্ধ হয়ে গেল। আমার ভাই মরুক, ছেলে মরুক, বা আমার স্ত্রী মরুক, কারো মৃত্যুকেই আমি পরওয়া করি না। আমি তো কেবল তোমারই মৃত্যুর ভয় করছিলাম।"

এই যে ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, মুসলমান সমাজ তা থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন বাহ্যিক পথ পাচ্ছিল না সে সময় ভীতির অবস্থাকে আল্লাহ তায়ালা নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দিলেন। হযরত আবুবকর (রা,) এর মারফতে খিলাফতের চাদরে মুসলমান জাতিকে আল্লাহ তায়ালা ঢেকে দিলেন। সেই সাথে জ্ঞান চক্ষু খুলে যাওয়ার মাধ্যমে এবং খিলাফতের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের কারণে ধর্মকে মু'মিনের জন্য সুদৃঢ় করে দেওয়া হয়েছিল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর আল-ওসীয়্যত পুস্তকে বর্ণনা করেন-"খোদা তায়ালা দুই প্রকারের কুদরত (শক্তি ও মহিমা) প্রকাশ করেন। প্রথমত, নবীগণের দ্বারা তাঁহার শক্তির এক হস্ত প্রদর্শন করেন। দ্বিতীয়ত, অপর হস্ত এরূপ সময়ে প্রদর্শন করেন, যখন নবীর মৃত্যুর পর বিপদাবলী উপস্থিত হয় এবং শত্রু শক্তি লাভ করিয়া মনে করে থাকে যে, এখন (নবীর) কার্য ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, তখন তাহাদের এই প্রত্যয়ও জন্মে যে, এখন জামাত (ধরা পৃষ্ঠ হইতে) বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। এমনকি জামাতের লোকজনও উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়েন, তাহাদের কটিদেশ ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং কোন-কোন দুর্ভাগা মুরতাদ হইয়া যায় তখন খোদা তায়ালা দ্বিতীয়বার আপন মহাকুদরত প্রকাশ করেন এবং পতনোম্মুখ জামাতকে রক্ষা করেন। সুতরাং যাহারা শেষ পর্যন্ত ধৈর্য অবলম্বন করে, তাহারা খোদা তায়ালার এই মু'জিযা প্রত্যক্ষ করে। যেমন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর সময় হইয়াছিল। যখন আঁ-হযরত (সা.) এর মৃত্যুকে এক প্রকার অকাল মৃত্যু মনে করা হইয়াছিল; বহু মরু-নিবাসী অজ্ঞ লোক মুরতাদ হইয়া গিয়াছিল এবং সাহাবাগণও শোকাভিভূত হইয়া উম্মাদের ন্যায় হইয়া পড়িয়া ছিলেন।তখন খোদা তায়ালা হযরত আবু বকর (রা.) কে দাঁড় করাইয়া পুনর্বার তাঁহার শক্তি ও কুদরতের দৃশ্য প্রদর্শন করেন। এইরূপে তিনি ইসলামকে বিলুপ্তির পথ হইতে রক্ষা করেন এবং সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন যাহা তিনি করিয়ছিলেন। আল্লাহ বলিয়াছেন- "ভয়ের পর আমি তাহাদিগকে আবার সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিব।" (সূরা নূর-৫৬)। হযরত মুসা (আ.)-এর সময়েও এমনই হইয়াছিল। হযরত মুসা (আ.) পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে বনী ইসরাঈলদিগকে গন্তব্য স্থানে উপনীত করিবার পূর্বেই মিশর হইতে কেনানের পথে মৃত্যবরণ করেন। ইহাতে বনী ইসরাঈলগণের মধ্যে তাঁহার মৃত্যুতে শোক ও আর্তনাদ উপস্থিত হইয়াছিল। তাওরাতে উল্লেখ আছে যে, বনী ইসরাঈলগণ এই অকাল মৃত্যুতে শোকাতুর হইয়া হযরত মুসা (আ.) এর এই আকস্মিক বিচ্ছেদের ফলে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত রোদন করিয়াছিল। অনুরূপ ঘটনা হযরত ঈসা (আ.) এর সময়ও ঘটিয়াছিল। ক্রুশের ঘটনাকালে তাঁহার সকল শিষ্য বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাহদের মধ্যে একজন ধর্মচ্যুতও হইয়াছিল।

অতএব, হে বন্ধুগণ! যেহেতু আদিকাল হইতে আল্লাহ তায়ালার বিধান ইহাই যে, তিনি দুইটি শক্তি প্রদর্শন করেন যেন বিরুদ্ধবাদীগণের দুইটি মিথ্যা উল্লাসকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করিয়া দেখান; সুতরাং এখন ইহা সম্ভবপর নহে যে, খোদা তায়ালা তাঁহার চিরন্তন নিয়ম পরিহার করিবেন। এজন্য আমি তোমাদিগকে যে কথা বলিয়াছি তাহাতে তোমরা দুঃখিত ও চিন্তিত হইও না। তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কারণ তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন এবং ইহার আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়। কেননা, ইহা স্থায়ী; যাহার ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইবে না। সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসিতে পারে না। কিন্তু যখন আমি চলিয়া যাইব, খোদা তখন তোমাদের জন্য সেই "দ্বিতীয় কুদরত" প্রেরণ করিবেন যাহা চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকিবে।" (আল ওসীয়্যত; বাংলা অনুবাদ, সেপ্টেম্বর ১৯৯১ এ প্রকাশিত; পৃষ্ঠা ১৪-১৫)।

যুগ ইমাম কেমন হবেন এবং তাঁর মধ্যে কি ধরনের শক্তি থাকবে সে সম্পর্কেও হযরত ইমাম মাহদী (আ.) দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। 'জরুরতুল ইমাম, গ্রন্থে তিনি (আ.) বলেন-"ইলহামী মণি-মাণিক্যের জহুরী হইতেছেন যুগ ইমাম।" (বাংলা সংস্করণ, এপ্রিল ২০০১; পৃষ্ঠা-২৩)।

তিনি আরো বলেন-

"যুগ ইমাম আপন প্রকৃতির মধ্যে নেতৃত্বের শক্তি ধারণ করেন। আল্লাহ তায়ালার শক্তিশালী হস্তে তাহার মধ্যে নেতৃত্বের স্বভাব সৃষ্টি করা হয়ে থাকে এবং ইহা আল্লাহ এক বিধান যে, তিনি মানব জাতিকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রাখিতে চাহেন না। বরং যেরূপে তিনি সৌর জগতে অনেক তারকাকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া সূর্যকে উক্ত জগতের অধিপতি করিয়া দিয়াছিলেন, তদ্রুপ তিনি সাধারণ বিশ্বাসীগণকে মর্যাদা অনুযায়ী তারকারাশির ন্যায় আলোক দান করিয়া যুগ ইমামকে তাহাদের সূর্যরূপে আখ্যা দিয়াছেন। ইহাই আল্লাহর বিধান। এমনকি তাঁহার সৃষ্টির বিধানে ইহা দৃষ্টিগোচর হয় যে, মধু মক্ষিকার মধ্যেও অনুরূপ ব্যবস্থাপনা বিদ্যমান রহিয়াছে। উহাদের মধ্যেও একজন নেত্রী থাকে--যাহাকে মক্ষিকারাণী বলা হয়। জগতেও আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করিয়াছেন যে, প্রত্যেক জাতিতে একজন আমীর বা শাসক থাকিবেন। (ঐ,পৃষ্ঠা-২৭)। যুগের বিশ্বাসীগণকে নেতৃত্বদানের যোগ্যতা সকল ব্যক্তির থাকে না। কেউ কেউ খোদা তায়ালা হতে সত্য বাণী প্রাপ্ত হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি বয়াত নেওয়ার অধিকার রাখেন না। ঐ ব্যক্তির হাতেই শুধুমাত্র বয়াতের অঙ্গীকার করা যায় যিনি খোদাতায়ালা হতে মনোনীত। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা মানুষকে নেতৃত্ব বিহীন অবস্থায় পতিত করে রাখতে চান না তাই তিনি যু গে যুগে নবী রাসুল বা তাদের পরে নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করে থাকেন। অনেকে হয়তো মনে করে থাকতে পারেন যে, ওলী-আল্লাহ আর যুগ ইমামের মধ্যে পার্থক্য-ই বা কি? মোট কথা হচ্ছে, যদি কেউ খোদা তায়ালা কর্তৃক আদিষ্ট না হন তাহলে তিনি যুগ ইমাম হলেও খলীফা বলে আখ্যায়িত হতে পারেন না। আর "মনোনীত" ছাড়া কেউ বয়াত গ্রহণ করতে পারে না। বয়াতের উদ্দেশ্য যদি শুধুমাত্র তওবা করা হতো তাহলে কোন ব্যক্তি নিজে নিজেই তওবা করে নিতে পারে। কিন্তু বয়াতের মূল উদ্দেশ্যই হলো ঐশী

তত্ত্বজ্ঞান লাভ ও নিদর্শন পাওয়া যার মাধ্যমে মু'মিনের হৃদয় সত্যিকার তওবায় দিকে ধাবিত হয়। শুধু ব্যক্তিগত কল্যাণ লাভ বা মানুষকে হেদায়াত দেওয়াই যুগ ইমামের কর্তব্য নয়; অধিকন্ড়যুগ ইমামের (যা প্রকৃতপক্ষে খিলাফত) মাধ্যমে জাতীয় আধ্যাত্মিক উন্নতি ও ধর্মের সাহায্য ও ইমানের দৃঢ়তা তরান্বিত হয়। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন "হে আমার বন্ধুরা! তোমাদের জন্য আমার শেষ নসিহত এই যে, সকল প্রকার কল্যাণরাজি খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। নবুওয়াত এক প্রকার বীজ স্বরূপ হয়ে থাকে; যার পর খেলাফত উহার প্রতিফলকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেয়। তোমরা খিলাফতে হাক্কা (আল্লাহর বানানো খিলাফত)-কে শক্ত করে ধরে এবং এর বরকত ও কল্যাণরাজি দ্বারা পৃথিবীকে উপকৃত কর যেন খোদা তায়ালা তোমাদের প্রতি করুণা করেন এবং তোমাদেরকে তিনি পৃথিবীতে উচ্চতা দান করেন এবং পরকালেও উচ্চতা দান করেন। মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত তোমরা প্রতিজ্ঞা পালন করে যাও। আমার বংশধর ও হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.) এর বংশধরদেরকে তাদের প্রতিজ্ঞা পালনের কথা স্মরণ করাতে থাক। তারা যেন আহমদীয়াতের মুবাল্লেগ তথা ইসলামের সত্য সৈনিক প্রমাণিত হয় এবং পৃথিবীতে খোদায়ে কুদ্দুসের কর্মকর্তা হয়।

(আল ফযল; ২০শে মে ১৯৫৯)

বয়াত ও খিলাফত পরস্পর আঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। বয়াত শব্দটি বায়উন হতে উৎপন্ন হয়েছে। বায়উন সেই দ্বি-পাক্ষিক চুক্তিকে বলে যার মাধ্যমে একে অপরকে কোন দ্রব্য অন্য দ্রব্যের বিনিময়ে দিয়ে থাকে। যুগ খলীফার হাতে বয়াত করে মু'মিন ব্যক্তি আপন সত্তাকে তার সমস্ত অধিকারসহ খলীফার হাতে এজন্য বিক্রি করে দেয় যেন তৎপরিবর্তে সে ঐশী মারেফাত ও কামালাত লাভ করে সদ্যজাত শিশুর মত পবিত্র হয়ে যায়। মাতৃময়ী- খিলাফতের ঐশী দুগ্ধধারা সেই শিশুর জীবন নির্বাহের উপাচার হয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভে সমর্থ হয়ে পরকালে নাজাতের দ্বারোদঘাটন হয়।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলেন "হে যারা ইমান এনেছ। তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর এবং আনুগত্য কর এই রাসুলের; এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে আদেশ দেওয়ার অধিকারী।"

(৪:৬০)।

একক নেতৃত্বের হাতে ইসলামী বিশ্ব এজন্য একত্রিত হওয়া প্রয়োজন যেন কল্যাণের ফল্গুধারা প্রবাহিত হয়। নফসানী তাড়না অবদমনের জন্য খিলাফত ব্যবস্থার চেয়ে উত্তম কোন ব্যবস্থাপনা হতে পারে না। প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরপুর সদা কল্যাণের দিকে আহ্বানকারী খলীফা জগতের পরিত্রানের পবিত্র দায়িত্ব স্বীয় স্কন্ধে বহন করে। খোদায়ে এলাহীর ফরমাবরদার হয়ে জগতকে নতুন আভরণে সাজায়। পৃথিবীর পংকিলতা পরিশোধনের এই মহান ব্যবস্থাপনা জগতের সামনে খোদা-দর্শনের দর্পন স্বরূপ আবির্ভূত হয়- যাতে মু'মিন খোদার ছায়া দেখতে পায় পাপ-তাপ হানা চির উদ্বেল বিমুগ্ধতা পরিতৃপ্ত করে পিয়াসীর আকাঙ্ক্ষাকে। মুহূর্তে মন গেয়ে উঠে "তোমরা এ ঝর্ণাতলায় নির্জনে মাটির এ কলস আমার ছাপিয়ে গেল কোন ক্ষণে।" (রবি ঠাকুর)। নির্ঝরে স্বপ্নভঙ্গ হয় মানবতার । পরম পুলকে লেকায়ে এলাহীর জন্য বিগলিত হয় সিজদগাহের প্রেরণা। অফুরন্ত প্রণয় রূপ নেয় প্রাপ্তির বাস্তবতায়। তাইতো মহান আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন "এবং তোমাদের মধ্যে (সদা) এমন এক জামাত থাকা দরকার যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং ন্যায়সঙ্গত কাজের আদেশ দিবে এবং অসঙ্গত কাজ করতে নিষেধ করবে। বস্তুত এরাই সফলকাম হবে।" (৩:১০৪-১০৫)।

যদি কেউ নিজেই কল্যাণকর না হয় তাহলে জগতকে কিভাবে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে? যদি কেউ খোদা কর্তৃক হেদায়াত প্রাপ্ত না হন তাহলে কিভাবে সম্ভব অন্যকে হেদায়াতের দিকে আকৃষ্ট করা। সেই উত্তম উদাহরণ যা হযরত মুহাম্মদ (সা.) স্থাপন করেছিলেন, তার পূর্ণতম বিকাশের অভিপ্রায়বিহীন নেকী কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে? সীসা গলিত প্রাচীরের মত কিভাবে এক জামাতভূক্ত থাকা সম্ভব যদি না সেই নেতৃত্বের নির্বাচন খোদা তায়ালা কর্তৃক হয়? বয়াতের মাধ্যমে খিলাফতের সাথে আকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন ব্যাতীত সেই জামাত প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় যার পথ নির্দেশ স্বয়ং খোদা তায়ালা করেন। "হযরত আবু যার গিফারী (রা.) বর্ণনা করেন, "হযরত রাসুলে করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি জামাত হতে এক বিঘৎ পরিমাণও দূরে সরে গেছে সে ইসলামের রশি আপন ঘাড় হতে খুলে ফেলেছে।" (আবু দাউদ-আহমদ; বাংলায় প্রকাশিত কুরআন ও জীবন গ্রন্থে র প্রথম সংস্করণ হতে ১৫ই ফেব্রুয়ারি ২০০৪) । ইসলামের রশিকে পবিত্র কুরআনে "হাবলুল্লাহ" বা আল্লাহর রজ্জু হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কোন ম'ুমিন একথা ভাবতেই পারে না যে, সে খোদার গোলামী হতে মুক্ত হয়ে নেতৃত্বহীন অবস্থায় পড়ে থাকবে। এই পরম সত্তার সাথে সম্পৃক্ততার নিমিত্তে ঐশী নেয়ামত এর সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখার মাঝেই জীবনের সাকুল্য কল্যাণ নিহিত। জীবনের আয়না ঘরে স্বীয় সত্তার বিসর্জন উজ্জ্বল করতে পারে পারলৌকিক মুক্তির প্রতিবিম্বকে। খিলাফতের উৎকর্ষের সাথে খোদা তায়ালার অস্তিত্বের সম্পর্ক বিদ্যমান। এই পৃথিবীতে খলীফার মাধ্যমে খোদা যুলজালাল নিজের অভিপ্রায়ের বাস্তবায়ন ঘটান। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় খোদার এই রশ্মি খুলে ফেলেছে সে নিজেকে অচিরেই ক্ষতিগ্রস্থতায় নিমজ্জিত দেখতে পায়। সেই গরুই বেশি আদর -যত্ন পায় যে গৃহস্থের হালে স্বীয় কাঁধ ঝুঁকিয়ে দেয়। নিজের সত্তাকে বিলীন করার ফলশ্রুতিতেই ফুল ফোটে, পাখি গায়, ফসলের সমারোহে মাঠ হাসে। "রৌদ্র ছায়ায় লুকোচুরি খেলা"-র মাঝে প্রতিবিম্বিত হয় ফসল ফলানোর আনন্দ। নিষ্ফলা মাঠের কৃষকের কোন মূল্য নেই। তাই আজ জগতের সামনে "খিলাফতে হাক্কা" তথা আহমদীয়া খিলাফতের সামনে নিজেকে সোপর্দ করা ছাড়া আর কোন বিকল্প পথ খোলা নেই। এতগুলো ইসলামী রাষ্ট্র আজ ইহুদী, খ্রীষ্টানের পদানত হয়ে আছে শুধুমাত্র খোদার রশি থেকে নিজেকে আলাদা রাখার কারণে। এই বৈরী বাতাস নিজেদের ঘরকে পর্যন্ত বিলীন করে দিচ্ছে। বসনিয়া, ফিলিস্তিন, ইরাক, আফগানিস্থান আজ চরম মাশুল দিচ্ছে বিচ্ছিন্নতার। একের পর এক এই বিভেদের জালে আটকে যাচ্ছে মানবতা। দিশেহারা উম্মতের পরিত্রাণ আজ খিলাফতের সাথে সংবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যত তাড়াতাড়ি শুভ বুদ্ধির উদয় হবে ততই মঙ্গল।

"হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত রাসুলে করীম (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের তিনটি বিষয় ভালবাসেন। এক- তিনি পছন্দ করেন যে, তোমরা তাঁর ইবাদত কর। তাঁর সাথে কোন কিছু বা কাকেও শরীক করো না। দুই, সকলেই তাঁর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর' ঐক্য ও একতার সাথে বসবাস কর এবং বিবাদ সৃষ্টি কর না, দলাদলি করো না। তিন, তিনি বাদ-প্রতিবাদ, কলহ ও বাড়াবাড়ি অধিকন্তু অপব্যয় করাকে পছন্দ করেন না।

"(মুসলিম; ঐ)। আল্লাহ আমাদের যে তিনটি জিনিস ভালবাসেন বলে আমরা জানতে পেরেছি তার সাথে নিশ্চয়ই আমরা একমত হয়ে আমল করতে পারি। একটু নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে সহজেই অনুমিত হয় যে, এই তিনটি বিষয় একত্রিতভাবে বাস্তবায়িত হতে হলে জগতে খিলাফতের প্রয়োজন আছে। আল্লাহ তাঁর নিজের প্রতি সবচেয়ে বেশি আত্মাভিমান রাখেন। তাঁর গয়রতের বিপরীত কোন কর্ম তিনি পছন্দ করবেন না। আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করার অর্থ হচ্ছে ইমান আনয়ন করা। তাঁর রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ করার অর্থ হলো মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর পরবর্তী ঐশী নিযামকে সমর্থন করা এবং যখনই খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে তখন তার সাথে নিজেকে সংযুক্ত রাখা একতাবদ্ধ রাখা। কলহ বাড়াবাড়ি অধিকন্তু অপব্যয় না করার মাঝে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, নিজের জীবন যাত্রা স্বাভাবিক রেখে উদ্ধৃত্ত অর্থ ইসলামের বিশ্ব বিজয়ের জন্য খরচ করে দেওয়া। হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন "এটা সম্ভব নয় যে, তোমরা দুটি বস্তুকে ভালবাসতে পার। তোমাদের জন্য সম্ভব নয় যে, তোমরা মালকেও ভালবাস এবং আল্লাহ তায়ালাকেও ভালবাস। শুধুমাত্র একটিকেই ভালবাসতে পার। এবং যদি কেউ আল্লাহকে ভালবেসে তাঁর পথে অর্থ ব্যয় করে তবে আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, তার অর্থে অন্যান্যদের তুলনায় অধিক বরকত দান করা হবে। কেননা, অর্থ আপনা-আপনি আসে না বরং আল্লাহর ইচ্ছায় আসে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে তার মালের একাংশ খরচ করে, সে অবশ্যই তা পাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি মালকে ভালবাসে, সে আল্লাহর পথে সেই খেদমত পালন করে না, যা তার পালন করা উচিত; তবে নিশ্চয়ই সে অর্থ (মাল) হারাবে।" (তবলীগে রেসালাত ঐ)।কেন একতাবদ্ধ থাকতে হবে? এই প্রশ্ন কারো কারো মনে উদ্রেক হতে পারে। বয়াত, খিলাফত, একক নেতৃত্ব এগুলো অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। বয়াতের মাধ্যমে খিলাফতের অধীনে সারা বিশ্বে কল্যাণ প্রদায়িনী মন্দাকিনী প্রবাহ বয়ে যায়। একতার দ্বারা সেই কাজ সমাধা হয় যা বিচ্ছিন্নভাবে করা সম্ভব নয়। পৃথিবীর কল্যাণের জন্য, নিজের নফসের উন্নতির জন্য এক নেতার অধীনে, তাঁর হাতে হাত দিয়ে এক খোদার জামাত গঠনের কোন বিকল্প নেই। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর পয়গামে সুলেহ গ্রন্থে লিখেন "এই কথা কারো কাছে অবিদিত নেই যে, একতা এমন এক শক্তি, যে সকল বিপদ কিছু তেই দূর হয় না এবং যে সমস্ত সমস্যা অন্য কোন উপায়েই সমাধান হয় না, একতা দ্বারা সহজেই হয়ে থাকে।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 4 Thursday,14 Nov , 2019 Issue No.46

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

অতএব একতার কল্যাণ হতে নিজেকে বঞ্চিত রাখা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়।" (ঐ)।তিনি (আ.) বলেন- " বয়াত (দীক্ষা গ্রহণ) এর উক্ত সিলসিলা প্রতিষ্ঠার একমাত্র উদ্দেশ্য হল, মুত্তাকীদের সংঘবদ্ধ দল সংগৃহীত করা। অর্থাৎ তাকওয়াপয়ায়ণ ব্যক্তিদের একটি জামাতের একত্র করা, যাতে এরূপ মুত্তাকীদের একটি ভারি সংঘ জগদ্বাসীর উপর স্বীয় নেক আসর (সুপ্রভাব) বিস্তার করতে পারে এবং তাদের ঐক্যবদ্ধতা ইসলামের জন্য বরকত, আযমত ও গৌরব এবং কল্যাণময় ফলোদয়ের কারণ হয় এবং একমাত্র পবিত্র কালেমায় ঐক্যবদ্ধ হবার বরকত ও কল্যাণে তারা ইসলামের পাক ও পবিত্র সেবা কার্য ও খেদমতসমুহ পালনে ত্বড়িৎ নিয়োজিত হতে পারে।"

(বিজ্ঞপ্তি ৪-৩-১৮৮৯, ঐ)।

যে নেতৃত্ব খোদা তায়ালা কর্তৃক মনোনীত নেতৃত্ব তার হাতে বয়াত করার অর্থ খোদা তায়ালার হাতে বয়াত করা। খলীফার হাতে হাত রেখে বয়াতের মাধ্যমে মু'মিনগণ সর্বদা অবিচল থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এর সাহাবাদের মত ইমানী চেতনায় বিভাসিত হয়ে প্রাণ বলে উঠে "আমরা আপনার ডানে লড়বো, আমরা আপনার বামে লড়বো,আমরা আপনার সামনে লড়বো, আমরা আপনার পেছনে লড়বো শত্রুগণ ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি পর্যন্তপৌঁছতে পারবে না, যতক্ষণ না আমাদের লাশের উপর দিয়ে যায়।" পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক ঘোষণা করেন-

"নিশ্চয়ই যারা তোমার বয়াত করে বাস্তবপক্ষে তারা আমাদের বয়াত করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর আছে। অতএব, যে ব্যক্তি (বয়াতের) অঙ্গীকারকে ভঙ্গ করে সে নিজেরই বিরুদ্ধে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। এবং যে ব্যক্তি এই অঙ্গীকারকে পূর্ণকরে যা সে আল্লাহর সাথে করেছে, তাকে তাকে অচিরেই তিনি মহা পুরষ্কার দান করবেন।" (৪৮:১১)।

একটু চিন্তা করলেই হৃদয় হতবিহ্বল হয়ে পড়ে যে, আল্লাহ আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যেতে চাইছেন আর আমরা কোথায় পৌঁছতে চলেছি। আমাদের চলন-বলন-কথন-মনন-বোধ-আত্মা সর্বোতভাবে যদি খিলাফতের অধীনে সমর্পিত না হয় তাহলে পারলৌকিক মুক্তির কোন পথ তো খোলা নেই-ই,অধিকন্ত দুনিয়াবী নানা অনাচারে আমরা জর্জরিত হয়ে পড়বো। সত্যিকার খিলাফতকে অস্বীকার করা খোদাকে অস্বীকার করা। তাই আজ ধ্বংসের আবর্জনার স্তুপে দাঁড়িয়েই সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমরা কি এখানেই থাকবো নাকি জগৎ ও নিজেদের কল্যাণার্থে খলীফার হা তে হাত রেখে সমপর্ণ করবো। জগতের মোহে অচেতন থেকে, আমিত্বের পূজায় মত্ত পূজারী সেজে কোন ভাবেই মুক্তি পাওয়া যাবে না।

"ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই
ছোট সে তরী,
আমারই সোনার ধানে
গিয়াছে ভরি।" (রবি ঠাকুর)।

হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) বয়াতকারীদের উদ্দেশ্যে কিছু শর্ত প্রণয়ন করে প্রকাশ করেন। নিম্নবর্ণিত শর্তের উপর যুগ খলীফার হাতে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা বয়াতের অঙ্গীকার করে থাকেন। হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বয়াতের শর্তসমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন-"বয়াতকারী সর্বান্ত করণে অঙ্গীকার করবে যে-

১। এখন হতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শিরক (আল্লাহর অংশীবাদিতা) হতে পবিত্র থাকবে।

২। মিথ্যা, ব্যাভিচার, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, যুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হতে দূরে থাকবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হোক না কেন, তার শিকারে পরিণত হবে না।

৩। বিনা ব্যতিক্রমে আল্লাহ্ ও রাসূলের হকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়বে, প্রত্যেহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্ তায়ালার নিকট প্রার্থনা করবে, এস্তেগফার পড়বে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাঁর অপার অনুগ্রহকে স্মরণ করে তাঁর হামদ ও তারিফ (প্রশংসা) করবে।

৪। উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহর সৃষ্ট কোন জীবকে বিশেষত কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

৫। সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তি তে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় আলণ্ঢাহ্ তায়ালার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থ ায় তাঁর সাথে সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে এবং সকল অবস্থায় তাঁর ফায়সালা মেনে নিবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে।

৬। সামাজিক কদাচার পরিহার করবে, কু-প্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোল আনা শিরোধার্য করবে। এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রাসুলে করীম (সা.) এর আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।

৭। ঈষা ও গর্ব সর্বতোভাবে পরিহার করবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সাথে জীবন যাপন করবে।

৮। ধর্ম ও ধর্মের সেবা করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হতে প্রিয়তর জ্ঞান করবে।

৯। আল্লাহ তায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্ট জীবের সেবায় যত্নবান থাকবে, এবং আল্লাহর দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করবে।

১০। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের। অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সাথে যে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হলে, জীবনের শেষ মুহুত পর্যন্ত তাতে অটল থাকবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশি গভীর ও ঘনিষ্ঠ হবে যে, দুনিয়ার কোন একার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে তার তুলনা পাওয়া যাবে না।"

(এশায়াতে তাকমীলে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারি ১৮৮৯ ইং, ঐ)।

এই শর্তের উপর যারা বয়াতের অঙ্গীকার করে থাকেন তাদের আধ্যাত্মিক অবস্থা ওলী, আউলিয়ার মতো হয়ে থাকে। বয়াতের শর্তের যথার্থ পালনই পারলৌকিক মুক্তির নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারে। চরম বৈরী পরিবেশেও খোদার এই নিযামের সাথে মানুষ বিশ্বস্ততা বজায় রেখেছে যুগের পর যুগ। নির্যাতনের যুপকাষ্ঠ আর শত্রুর চোখ রাঙানির রক্তাক্ত অভিব্যক্তির জালকে মু'মিন এক নিমেষেই করেছে চূর্ণ েপরিপূর্ণতা পেয়েছে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর অমোঘ বাণী "নোমান বিন বশীর হোজায়ফা থেকে রেওয়ায়াত করেছেন-রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- তোমাদের মধ্যে নবুওয়াত ততদিন পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতদিন আল্লাহ তায়ালা চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তা উঠিয়ে নিবেন। তারপর নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে, এবং তা ততদিন পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে যতদিন আল্লাহ তায়ালা চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন যুলুম ও অত্যাচারের রাজত্ব কায়েম হবে। এবং তা ততদিন পর্যন্ত থাকবে, যতদিন আল্লাহ তায়ালা চাইবেন, অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তা উঠিয়ে নিবেন। এরপর তা অহংকার ও জবরদস্তিমূলক সাম্রাজ্যে পরিণত হবে, এবং তা ততদিন পর্যন্ত থাকবে আল্লাহ্ তায়ালা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন পুনরায় নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। অতঃপর আঁ-হযরত (সা.) চুপ হয়ে গেলেন।" (আহমদ-বায়হাকী)।

(শেষাংশ পরের সংখ্যায়)

যুগ ইমামের বাণী

কুরআন করীমের শিক্ষার উপর আমল করেই তাকওয়া সৃষ্টি হওয়া এবং ব্যবহারিক সৌন্দর্য বিকশিত হওয়া সম্ভব।

মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৬৫)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

যুগ খলীফার বাণী

খিলাফত ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিধান ও ব্যবস্থাপনারই একটি অঙ্গ।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Kibria and Family, Jamat Ahmadiyya Santoshpur

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir